ট্রান্সপারেন্সি
ইন্টারন্যাশনাল
বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রভাষক নিয়োগ:
সুশাসনের চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের উপায়

ডিসেম্বর ১৮, ২০১৬

সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রভাষক নিয়োগ: সুশাসনের চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের উপায়

গবেষণা উপদেষ্টা

অ্যাডভোকেট সুলতানা কামাল, চেয়ারপারসন, ট্রাস্টি বোর্ড, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)

অধ্যাপক ড. সৈয়দ মঞ্জুরুল ইসলাম, সদস্য, ট্রাস্টি বোর্ড, টিআইবি

ড. ইফতেখারুজ্জামান, নির্বাহী পরিচালক, টিআইবি

অধ্যাপক ড. সুমাইয়া খায়ের, উপ-নির্বাহী পরিচালক, টিআইবি

মোহাম্মদ রফিকুল হাসান, পরিচালক - রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি, টিআইবি

তত্ত্বাবধান
আবু সাঈদ মো. জুয়েল মিয়া, সিনিয়র প্রোগ্রাম ম্যানেজার - রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি, টিআইবি

গবেষণা ও প্রতিবেদন প্রণয়ন

মো. রেযাউল করিম, প্রোগ্রাম ম্যানেজার - রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি, টিআইবি

দিপু রায়, প্রোগ্রাম ম্যানেজার - রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি, টিআইবি

মো. মোস্তফা কামাল, ডেপুটি প্রোগ্রাম ম্যানেজার - রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি, টিআইবি

গবেষণা সহায়তায়
আরফানুল ইসলাম, শিক্ষানবীশ, টিআইবি

যোগাযোগ
ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
মাইডাস সেন্টার (পঞ্চম তলা)
বাড়ি ৫, সড়ক ১৬ (নতুন) ২৭ (পুরাতন), ধানমন্ডি, ঢাকা ১২০৯
ফোন: (+৮৮০-২) ৯১২৪৭৮৮, ৯১২৪৭৮৯
ফ্যাক্স: (+৮৮০-২) ৯১২৪৭৯১৫
ই-মেইল: info@ti-bangladesh.org
ওয়েবসাইট: www.ti-bangladesh.org

মুখবন্ধ

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) দুর্নীতি প্রতিরোধ ও সুশাসন প্রতিষ্ঠায় সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টির ব্রত নিয়ে দু'দশক ধরে কাজ করে আসছে। এর অংশ হিসেবে টিআইবি জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে জনগুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন খাত ও প্রতিষ্ঠান নিয়ে গবেষণা ও অ্যাডভোকেসি কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। টিআইবি'র কর্মক্ষেত্রের একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ খাত শিক্ষা। বাংলাদেশে শিক্ষার সর্বোচ্চ স্তর বিশ্ববিদ্যালয় ভিত্তিক শিক্ষা। সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে শিক্ষক নিয়োগে সুশাসনের চ্যালেঞ্জ চিহ্নিতকরণ ও তা থেকে উত্তরণে ইতিবাচক ভূমিকা পালনের জন্য এই গবেষণাটি পরিচালনা করা হয়েছে।

বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের লক্ষ্য হলো উচ্চ শিক্ষিত ও দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলা এবং সেই সাথে নতুন জ্ঞানের উদ্ভাবন ও সঞ্চারণ। উচ্চশিক্ষার গুণগত মান নির্ভর করে শিক্ষকদের উচ্চতর জ্ঞান ও পাঠদান দক্ষতার ওপর। কিন্তু দেশের সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে প্রভাষক নিয়োগে সুস্পষ্ট ও পূর্ণাঙ্গ বিধিমালার অভাব; নিয়োগ প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার ঘাটতি; নিয়োগের মাপকাঠি হিসেবে দলীয় রাজনৈতিক, ধর্মীয় ও আঞ্চলিক পরিচয়; অবৈধ আর্থিক লেনদেন এমনকি ব্যক্তিগত পছন্দ ও অপছন্দ ইত্যাদি উপাদানের ক্রমবর্ধমান প্রাধান্যে শিক্ষাগত যোগ্যতার অবমূল্যায়নের প্রাতিষ্ঠানীকরণের চিত্র এ গবেষণায় উঠে এসেছে। সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠ হিসেবে সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের জ্ঞান চর্চার সহায়ক পরিবেশ তৈরির মধ্য দিয়ে দক্ষ ও সুশিক্ষিত জনশক্তি তৈরির লক্ষ্য বহুলাংশে ব্যাহত হচ্ছে। অন্যদিকে এরূপ সার্বিক প্রেক্ষিতেও কোনো কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক নিয়োগে তুলনামূলক সুষ্ঠু ও স্বচ্ছ প্রক্রিয়ায় শিক্ষাগত যোগ্যতা-নির্ভর নিয়োগ নিশ্চিত করা হচ্ছে যা আমাদেরকে আশান্বিত করেছে।

গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত ১৩টি সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন পর্যায়ের বর্তমান ও প্রাক্তন শিক্ষক, বিভাগীয়/ইনস্টিটিউট প্রধান, ডিন, সিন্ডিকেট সদস্য, উপাচার্য ও উপ-উপাচার্যদের একাংশ, শিক্ষক সমিতির নেতা, বিশেষজ্ঞ শিক্ষক, নিয়োগ পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী, অধ্যয়নরত শিক্ষার্থী, বিশ্ববিদ্যালয়ভিত্তিক ছাত্র সংগঠনের প্রতিনিধিদের পাশাপাশি শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের সম্মানিত চেয়ারম্যান ও সদস্যসহ ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা এবং সংশ্লিষ্ট গবেষকদের মতামত ও অভিজ্ঞতা-নির্ভর তথ্য বিশ্লেষণ করে প্রতিবেদনটি তৈরি করা হয়েছে। যাঁরা এ প্রক্রিয়ায় তথ্য, অভিজ্ঞতা ও অভিমত প্রদান করে সহযোগিতা করেছেন তাঁদের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

গবেষণাটি সম্পন্ন করেছেন টিআইবি'র গবেষক মো. রেযাউল করিম, দিপু রায় ও মো. মোস্তফা কামাল। তথ্য সংগ্রহে তাদেরকে সহায়তা করেছেন শিক্ষানবিশ এস. এম. আরফানুল আলম। ঊর্ধ্বতন কর্মসূচী ব্যবস্থাপক (আর অ্যান্ড পি) আবু সাঈদ মো. জুয়েল মিয়া প্রতিবেদনটি সম্পাদনা করেছেন। এছাড়া টিআইবি'র গবেষণা ও পলিসি বিভাগসহ বিভিন্ন বিভাগের কর্মকর্তাগণ পরামর্শ দিয়ে সহায়তা করেছেন।

টিআইবি'র ট্রাস্টি বোর্ডের সভাপতি অ্যাডভোকেট সুলতানা কামাল এই গবেষণা সম্পন্ন করতে অনুপ্রেরণা দিয়েছেন। টিআইবি'র উপ-নির্বাহী পরিচালক অধ্যাপক ড. সুমাইয়া খায়ের এবং গবেষণা ও পলিসি বিভাগের পরিচালক মোহাম্মদ রফিকুল হাসান মূল্যবান মতামত দিয়ে প্রতিবেদনটিকে সমৃদ্ধ করেছেন। এই প্রতিবেদনে উপস্থাপিত তথ্য, বিশ্লেষণ ও সুপারিশসমূহ সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে প্রভাষক নিয়োগ প্রক্রিয়া ও পদ্ধতিকে অধিকতর স্বচ্ছ ও জবাবদিহিমূলক করতে সহায়ক হলে আমাদের প্রচেষ্টা সার্থক হবে। এর পরিবর্ধন, পরিমার্জন ও সংশোধনে পাঠকদের পরামর্শ সাদরে গৃহীত হবে।

ইফতেখারুজ্জামান
নির্বাহী পরিচালক

সূচিপত্র

পৃষ্ঠা

মুখবন্ধ II

সার-সংক্ষেপ III

প্রথম অধ্যায়: ভূমিকা ১-৫

১.১ গবেষণার প্রেক্ষাপট ও যৌক্তিকতা ১

১.২ গবেষণার উদ্দেশ্য ৩

১.৩ গবেষণার পরিধি ৩

১.৪ গবেষণা পদ্ধতি ৪

১.৪.১ তথ্যের উৎস ৪

১.৪.২ তথ্যের যথার্থতা ও নির্ভরযোগ্যতা ৫

১.৪.৩ গবেষণার সময় ও বিবেচ্য সময়সীমা ৫

১.৫ প্রতিবেদন কাঠামো ৫

দ্বিতীয় অধ্যায়: সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রভাষক নিয়োগে আইনি ও প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো এবং সীমাবদ্ধতা ৬-১২

২.১ গবেষণার আওতাভুক্ত সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় ৬

২.২ প্রভাষক নিয়োগের আইনি ও জবাবদিহিতা কাঠামো ৭

২.৩ প্রভাষক নিয়োগের বিভিন্ন ধাপ ৭

২.৩.১ ধাপ ১: নিয়োগ চাহিদা ৭

২.৩.২ ধাপ ২: পদ সংখ্যা অনুমোদন ৮

২.৩.৩ ধাপ ৩: নিয়োগের শর্ত নির্ধারণ ও বিজ্ঞপ্তি ৮

২.৩.৪ ধাপ ৪: প্রার্থীতা মূল্যায়ন ও পরীক্ষার জন্য ডাকা ৮

২.৩.৫ ধাপ ৫: নিয়োগ পরীক্ষা ৯

২.৩.৬ ধাপ ৬: চূড়ান্ত অনুমোদন ৯

২.৪ প্রভাষক নিয়োগের ক্ষেত্রে আইনি ও প্রাতিষ্ঠানিক সীমাবদ্ধতা ৯

তৃতীয় অধ্যায়: প্রভাষক নিয়োগ প্রক্রিয়ায় অনিয়ম ও দুর্নীতি এবং সংশ্লিষ্ট অংশীজন ১৩-২৭

৩.১ নিয়োগ পূর্ব অনিয়ম-দুর্নীতি ১৩

৩.২ নিয়োগ প্রক্রিয়ার বিভিন্ন ধাপে অনিয়ম ও দুর্নীতি ১৪

৩.৩ অনিয়ম-দুর্নীতির উপাদান বা প্রভাবক ২২

৩.৪ অনিয়ম-দুর্নীতির সাথে সংশ্লিষ্ট অংশীজন ২৫

চতুর্থ অধ্যায়: উপসংহার ও সুপারিশ ২৮-৩০

৪.১ উপসংহার ২৮

৪.২ সুপারিশ ২৯

তথ্যপঞ্জী ৩১

সারণি, চিত্র ও বক্স এর তালিকা

সারণি **পৃষ্ঠা নম্বর**

সারণি ১.১: প্রত্যক্ষ তথ্যদাতাদের ধরন ৪
সারণি ১.২: ধরনভেদে বিশ্ববিদ্যালয় নির্বাচন ৪
সারণি ২.১: এক নজরে গবেষণার অন্তর্ভুক্ত সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়, শিক্ষক ও শিক্ষার্থী ৬
সারণি ২.২: রাজনৈতিক বিবেচনায় মনোনীত ব্যক্তিদের নিয়োগ বোর্ড/নির্বাচন কমিটিতে অন্তর্ভুক্তির ঝুঁকির চিত্র ১০

চিত্র **পৃষ্ঠা নম্বর**

চিত্র ২.১: নিয়োগের ধাপ ৮
চিত্র ৩.১: প্রভাষক নিয়োগ সংশ্লিষ্ট অনিয়ম ও দুর্নীতিতে জড়িত অংশীজনের আন্ত:সম্পর্ক ২৭
চিত্র ৪.১: প্রভাষক নিয়োগে অনিয়ম ও দুর্নীতির কারণ, ফলাফল ও প্রভাব ২৮

বক্স **পৃষ্ঠা নম্বর**

বক্স ৩.১: ফলাফল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের উদাহরণ ১৩
বক্স ৩.২: বিশেষ সম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যমে নিয়োগ ১৪
বক্স ৩.৩: প্রয়োজন না থাকা সত্ত্বেও নিয়োগ ১৫
বক্স ৩.৪: প্রয়োজন থাকা সত্ত্বেও নিয়োগের চাহিদা না দেওয়ার উদাহরণ ১৫
বক্স ৩.৫: সিজিপিএ কমানোর বিষয়ে সিন্ডিকেট সভার সিদ্ধান্ত ১৬
বক্স ৩.৬: পছন্দের প্রার্থীকে নিয়োগের জন্য সিজিপিএ কমানোর উদাহরণ ২৬
বক্স: ৩.৭ বিশেষ যোগ্যতার সুযোগে তুলনামূলক কম যোগ্য প্রার্থীকে নিয়োগ ১৭
বক্স: ৩.৮ পছন্দের প্রার্থীকে নিয়োগের জন্য বিজ্ঞপ্তিতে বিশেষ বিষয়ের নাম উল্লেখ ১৭
বক্স: ৩.৯ নিয়োগের শর্ত ভঙ্গের কয়েকটি উদাহরণ ১৮
বক্স: ৩.১০ নির্দিষ্ট প্রার্থীদের নিয়োগ নিশ্চিত করতে নিয়োগ বোর্ড পুনর্গঠন ও বাতিলের উদাহরণ ১৯
বক্স: ৩.১১ তুলনামূলক কম যোগ্যতাসম্পন্ন প্রার্থীকে নিয়োগ প্রদান ১৯
বক্স: ৩.১২ কয়েকটি অপ্রাসঙ্গিক প্রশ্ন ও মন্তব্য ২০
বক্স: ৩.১৩ বিষয়-বহির্ভূত প্রশ্নের উদাহরণ ২০
বক্স ৩.১৪: স্বজনপ্রীতির উদাহরণ ২৩
বক্স ৩.১৫: আঞ্চলিকতাকে প্রাধান্য দিয়ে নিয়োগের কিছু উদাহরণ ২৪
বক্স ৩.১৬: প্রথম শ্রেণিতে প্রথম ও অনুষদে রেকর্ড পরিমাণ নম্বর পেয়েও নিয়োগপ্রাপ্তি হতে বঞ্চিত হওয়া ২৪
বক্স ৩.১৭: একটি প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের দু'টি ঘটনা ২৫
বক্স ৩.১৮: নিয়োগ পেতে ১০ লক্ষ টাকা ২৫
বক্স ৩.১৯: প্রভাষক হিসেবে নিয়োগের জন্য ১৬ লক্ষ টাকা দাবি ২৫

প্রথম অধ্যায়
ভূমিকা

১.১ গবেষণার প্রেক্ষাপট ও যৌক্তিকতা

শিক্ষা মানুষের একটি অন্যতম মৌলিক অধিকার।[১] বাংলাদেশের সংবিধানে শিক্ষাকে জীবন ধারণের অন্যতম মৌলিক উপকরণ হিসেবে নির্ধারণ করা হয়েছে।[২] শিক্ষার এই গুরুত্ব বিবেচনা করে পৃথিবীর যেকোনো দেশের ন্যায় বাংলাদেশেও শিক্ষা একটি অন্যতম অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত খাত। শিক্ষা ব্যবস্থার সর্বোচ্চ পর্যায় হলো বিশ্ববিদ্যালয় ও সমপর্যায়ের প্রতিষ্ঠানভিত্তিক উচ্চশিক্ষা কার্যক্রম যার লক্ষ্য হলো 'জ্ঞান সঞ্চারণ ও নতুন জ্ঞানের উদ্ভাবন এবং সেই সঙ্গে দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলা।'[৩] উচ্চশিক্ষাকে গুরুত্ব দিয়ে বর্তমান সরকার পাবলিক (সরকারি) বিশ্বদ্যিালয়গুলোর প্রশাসনিক ও পরিচালন ব্যাবস্থাকে অধিকতর গণতান্ত্রিক, স্বচ্ছ ও জবাবদিহিমূলক করার পাশাপাশি শিক্ষকদের দলাদলির কারণে শিক্ষা কার্যক্রম যাতে ব্যাহত না হয় সে লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশগুলো পুনর্মূল্যায়ন এবং সংশোধন করা হবে বলে তাদের নির্বাচনী ইশতেহারে প্রতিশ্রুতি প্রদান করে।[৪]

উচ্চশিক্ষার কারিগর হচ্ছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সমাজ। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ শিক্ষকতা, গবেষণা ও জ্ঞানচর্চার কেন্দ্রবিন্দু। উচ্চশিক্ষার গুণগত মান ও দক্ষতা মূলত নির্ভর করে শিক্ষকদের পাঠদানে উচ্চতর জ্ঞান, দক্ষতা ও সক্ষমতার ওপর। একজন শিক্ষকই পারেন শিক্ষার্থীদের পড়াশোনা, গবেষণা ও জ্ঞানার্জনে অধিকতর মনোযোগী করে তুলতে ও ভাবনার জগতের জানালা খুলে দিতে।[৫] এসব বিষয়ের ওপর গুরুত্বারোপ করে জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০-এ উল্লেখ করা হয়েছে, 'শিক্ষকের গুণগত মান নিশ্চিত করার জন্য একদিকে প্রয়োজন বিজ্ঞানসম্মত ও স্বচ্ছ প্রক্রিয়ায় যোগ্য শিক্ষক নিয়োগ করা, অন্যদিকে প্রয়োজন মানসম্মত শিক্ষক-শিক্ষা এবং চাহিদাভিত্তিক যুগোপযোগী ও পৌনঃপুনিক শিক্ষক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে শিক্ষকদের পেশাগত উৎকর্ষ সাধন করা।'[৬]

বাংলাদেশে প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষকদের জন্য সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা থাকলেও 'সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের'[৭] শিক্ষকদের জন্য তা নেই। ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ আরও উচ্চ সনদ ও সম্মান অর্জন করলেও তাঁদের পেশাগত দক্ষতা ও উৎকর্ষ বৃদ্ধি করার প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগ এদেশে অনুপস্থিত। এর প্রভাব পড়ে উচ্চ শিক্ষার গুণগত মানের ওপর। গুণগত মানসম্পন্ন বিশেষ করে শ্রেণিকক্ষে পাঠদানে সক্ষম শিক্ষক নির্বাচন ও নিয়োগ প্রদান বর্তমানে একটি দুরূহ বিষয়। সাম্প্রতিকালে কয়েকটি সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়োগ প্রক্রিয়াকে স্বচ্ছ এবং মেধাবিদের নিয়োগ প্রদানের পদক্ষেপ গ্রহণ করলেও বাস্তবে এর কার্যকর প্রয়োগ এখনও পুরোপুরি শুরু হয় নি। বরং দেশের অন্যান্য যেকোনো সরকারি প্রতিষ্ঠানের ন্যায় সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক নিয়োগ প্রক্রিয়া ও এ সংক্রান্ত কার্যক্রমে স্বচ্ছতা, সততা ও জবাবদিহিতার বিষয়টি প্রশ্নবিদ্ধ।

বাংলাদেশে সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রভাষক নিয়োগে অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগ নতুন নয়। তবে নব্বইয়ের দশকের শুরুতে সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রভাষক নিয়োগ প্রক্রিয়ায় রাজনৈতিক বিবেচনা প্রকাশ্যরূপ ধারণ করে এবং তা ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে থাকে। বিভিন্ন গবেষণায় সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রভাষক নিয়োগ প্রক্রিয়ায় অনিয়ম ও দুর্নীতির তথ্য উঠে এসেছে। কিছু গবেষণায় সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রভাষক নিয়োগে রাজনৈতিক প্রভাব যে একটি অন্যতম নির্ধারক হিসেবে ভূমিকা পালন করেছে সে বিষয়টি উঠে এসেছে। আশরাফ এর মতে, স্বাধীনতার পর হতে বিশ্ববিদ্যালয়ে বিভিন্ন রাজনৈতিক মতাদর্শের অনুসারী শিক্ষক

---

[১] অনুচ্ছেদ ২৬, *সর্বজনীন মানবাধিকারের ঘোষণাপত্র*।

[২] 'রাষ্ট্রের অন্যতম মৌলিক দায়িত্ব হইবে পরিকল্পিত অর্থনৈতিক বিকাশের মাধ্যমে উৎপাদন শক্তির ক্রমবৃদ্ধিসাধন এবং জনগণের জীবনযাত্রার বস্তুগত ও সংস্কৃতিগত মানের দৃঢ় উন্নতিসাধন, যাহাতে নাগরিকদের জন্য নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ অর্জন নিশ্চিত করা যায়:
(ক) অন্ন, বস্ত্র, আয়, শিক্ষা ও চিকিৎসাসহ জীবনধারণের মৌলিক উপকরণের ব্যবস্থা।' সূত্রঃ অনুচ্ছেদ ১৫ (ক), *গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান*।

[৩] গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, *জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০*, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, পৃ. ২২।

[৪] বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ, *নির্বাচনী ইশতেহার ২০১৪*।

[৫] Muhammad Yeahia Akhter, ''Transparency in Tertiary Education: Politics, Admission and Recruitment,'' In *University of Dhaka*, ed. Imtiaz Ahmed and Iftekhar Iqbal (Dhaka: Prothoma Prokashan, 2016), 286.

[৬] *জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০*, পৃ. ৫৬।

[৭] যেসব বিশ্ববিদ্যালয় সাধারণত সরকারের নিকট হতে আর্থিক সুবিধা পেয়ে থাকে, সেসব বিশ্ববিদ্যালয়কে সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় বলা হয়।

নেতৃবৃন্দ ও তাদের অনুসারীদের (শিক্ষক) মধ্যে পৃষ্ঠপোষক-সমর্থকগোষ্ঠী (প্যাট্রন-ক্লায়েন্ট) সম্পর্ক সৃষ্টিসহ মেরুকরুণ তৈরি হয় যা সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক নিয়োগে অন্যতম নির্ধারক হিসেবে কাজ করে।[৮]

পান্ডে ও জামিল[৯] পুরো নিয়োগ প্রক্রিয়ায় ‘রাজনীতিকীকরণ’ ও রাজনৈতিক চাপে প্রভাবিত হওয়ার ঘটনা প্রত্যক্ষ করেছেন। তাঁদের মতে, মূলত দলীয় রাজনৈতিক শিক্ষক নিয়োগের লক্ষ্য থাকে সরকার সমর্থক শিক্ষক ও বিশ্ববিদ্যালয়ভিত্তিক ভোটার তৈরি করা। এ প্রক্রিয়াটি সহজ করার জন্য সরকার পরিবর্তনের সাথে সাথে সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভাইস চান্সেলর পদে পরিবর্তন আনা হয়। এরপর বিশ্ববিদ্যালয়ভিত্তিক প্রশাসনকে একই প্রক্রিয়ায় ঢেলে সাজানো হয়। প্রভাষক নিয়োগ শুধু মৌখিক পরীক্ষাভিত্তিক হওয়ায় সাক্ষাৎকার বোর্ড কর্তৃক নিয়োগকে প্রভাবিত করার সুযোগ থাকে। এমতাবস্থায় বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন এমন শিক্ষক তথা ‘ভোটার’[১০] নিয়োগের চেষ্টা করেন যাতে তারা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন নির্বাচনে সরকারের রাজনৈতিক দল সমর্থক বা দলকর্তৃক মনোনীত প্রার্থীদেরকে ভোট দিয়ে নির্বাচিত করতে পারেন। নিয়োগ প্রক্রিয়া রাজনীতিকীকরণের ফলে শিক্ষার গুণগত মান বিনষ্ট হওয়ার পাশপাশি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো উৎকর্ষ সাধন কেন্দ্র (সেন্টার অব অ্যাক্সিলেন্স) হওয়ার পরিবর্তে রাজনীতির কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে বলে অভিমত রয়েছে।[১১]

আখতার এর মতে, সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রভাষক নিয়োগ ত্রুটিপূর্ণ এবং কোনোভাবেই তা মেধানির্ভর নয়।[১২] প্রভাষক নিয়োগ প্রক্রিয়ায় অ্যাকাডেমিক যোগ্যতা মূল পরিমাপক বা নির্ধারক হিসেবে বিবেচিত হয় না। বরং রাজনৈতিক পরিচয়, সম্পৃক্ততা ও প্রভাব অন্যতম নির্ধারক হিসেবে গণ্য করা হয়। রাজনৈতিক সুপারিশ, চাপ ও তদ্বিরের মাধ্যমে অপেক্ষাকৃত মেধাবী ও যোগ্য প্রার্থীগণ শিক্ষক হওয়ার সুযোগ হতে বঞ্চিত হয়। প্রায় সব সরকারের আমলেই দলীয় সমর্থক শিক্ষক নিয়োগের অভিযোগ বিদ্যমান। বর্ণভিত্তিক[১৩] দলের বা ‘ভোট ব্যাংক’ এর প্রসার ঘটাতে এ ধরনের নিয়োগ প্রদান করা হয়। এক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রভাষক নিয়োগ সংক্রান্ত আইন লঙ্ঘনের নানা ঘটনার অভিযোগ রয়েছে, যেমন - ইউজিসির অনুমোদন না নিয়ে নিয়োগ; সংশ্লিষ্ট বিভাগের চাহিদা বা সম্মতি ছাড়া নিয়োগ; বিজ্ঞপ্তি ছাড়া কিংবা বিজ্ঞপ্তির কয়েকগুণ অতিরিক্ত শিক্ষক নিয়োগসহ বিধি-বহির্ভূতভাবে অর্থ লেনদেনের মাধ্যমে প্রভাষক নিয়োগ, ইত্যাদি।[১৪] এ বিষয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের নির্লিপ্ত ভূমিকাও আখতার প্রত্যক্ষ করেছেন।[১৫]

এছাড়া দেশের বিভিন্ন গণমাধ্যমে সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রভাষক নিয়োগে অনিয়ম ও দুর্নীতির ক্ষেত্র ও ধরন সম্পর্কিত তথ্য প্রচারিত ও প্রকাশিত হয়েছে, যেমন - রাজনৈতিক পরিচয়, সম্পৃক্ততা, প্রভাব ও দলীয় বিবেচনা[১৬]; নির্ধারিত প্রার্থীদের নিয়োগ সহায়ক যোগ্যতা ও শর্ত নির্ধারণ, শিথিল বা অতিরিক্ত শর্ত আরোপ[১৭]; বিভাগীয় চাহিদা বা সম্মতি না নিয়ে নিয়োগ চাপিয়ে

---

[৮] ASM Ali Ashraf, 'Political Cleavages, Patronage and Campus Insecurity,” In *University of Dhaka*, edited Imtiaz Ahmed and Iftekhar Iqbal (Dhaka: Prothoma Prokashan, 2016), 201.

[৯] Pranab Kumar Panday and Ishtiaq Jamil, *Impact of Politicization on the Recruitment of University Teachers in Bangladesh: The Case of the University of Rajshahi*, p.1-12. Available at http://www.napsipag.org/pdf/pranab.pdf. Accessed on August 30, 2016.

[১০] প্রাগুপ্ত, ৯।

[১১] প্রাগুপ্ত, ১২।

[১২] মুহাম্মদ ইয়াহ্ইয়া আখতার, *সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে দুর্নীতি: স্বরূপ ও প্রতিকার* (ঢাকা: ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ ও এএইচ ডেভেলপমেন্ট পাবলিশিং হাউজ, ২০০৮), ৫৪।

[১৩] সরকারি বিশ্ববিদ্যালগুলোতে অধিকাংশ শিক্ষকই পরোক্ষভাবে বিভিন্ন রং বা বর্ণভিত্তিক প্যানেল, যেমন- সাদা প্যানেল, নীল প্যানেল, গোলাপী প্যানেল ইত্যাদি নামে কোনো না কোনো দলের অধীনে শিক্ষক রাজনীতি করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ভিত্তিক এসব প্যানেল কোনো না কোনো রাজনৈতিক দলের মতাদর্শের অনুসারী।

[১৪] Muhammad Yeahia Akhter, “Transparency in Tertiary Education: Politics, Admission and Recruitment”, In *University of Dhaka*, ed. Imtiaz Ahmed and Iftekhar Iqbal (Dhaka: Prothoma Prokashan, 2016), 290; আখতার, *সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে দুর্নীতি*, ৫৩-৫৪।

[১৫] Akhter, 2016, ২৮৭; *The NewAge*, August ১০, ২০১৪.

[১৬] Hasan Jahid Tusher, “Teachers' link to politics blamed for political appointment at DU," *The Daily Star*, September 18, 2005; শরিফুজ্জামান, “অনিয়মের জালে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়,”*প্রথম আলো*, জুলাই ৬, ২০১৪;*The Daily Star*, August 7, 2008; নিবারণ বড়ুয়া, “শিক্ষকদের আসল যোগ্যতা দলীয় রাজনীতি,” *বাংলাদেশ প্রতিদিন*, জুন ২২, ২০১৩; *বাংলাদেশ প্রতিদিন*, এপ্রিল ২৪, ২০১৪; *যুগান্তর*, নভেম্বর ৬, ২০১৩; *কালের কণ্ঠ*, ফেব্রুয়ারি ২০১৬;

[১৭] *প্রথম আলো*, ডিসেম্বর ২০, ২০১৪; শরিফুজ্জামান, “অনিয়মের জালে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়,”*প্রথম আলো*, জুলাই ৬, ২০১৪; বড়ুয়া, “শিক্ষকদের আসল যোগ্যতা দলীয় রাজনীতি।”; *বাংলাদেশ প্রতিদিন*, এপ্রিল ২৪, ২০১৪;

দেওয়া;[১৮] উপাচার্য'র নির্বাহী ক্ষমতা প্রয়োগ করে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ ছাড়াই নিয়োগ[১৯]; বিজ্ঞাপিত পদের অতিরিক্ত নিয়োগ[২০]; স্বজনপ্রীতি (স্ত্রী, সন্তান, ভাইবোন, ভগ্নিপতি, শ্যালিকা, পুত্রবধু, মেয়ের জামাতাকে নিয়োগ প্রদান)[২১]; আঞ্চলিকতা/এলাকাপ্রাতি[২২]; দলীয় বিবেচনায় অধিক যোগ্য প্রার্থীদের বাদ দিয়ে অপেক্ষাকৃত কম যোগ্য প্রার্থীদের নিয়োগ[২৩]; বিশ্ববিদ্যালয়ভিত্তিক বিভিন্ন নির্বাচনে প্রভাব বিস্তারের লক্ষ্যে ভোটার বৃদ্ধির জন্য নিয়োগ[২৪]; বিধিবহির্ভূত অর্থ লেনদেন[২৫]; দুর্নীতির প্রমাণ মিললেও ব্যবস্থা না নেওয়া[২৬], ইত্যাদি। তবে প্রাসঙ্গিক বিষয়ে বিদ্যমান গবেষণা ও গণমাধ্যমে সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রভাষক নিয়োগ সংক্রান্ত বিভিন্ন অনিয়ম ও দুর্নীতির বিষয়ে উল্লেখ করা হলেও নিয়োগের বিভিন্ন ধাপে সুশাসনের চ্যালেঞ্জ সংক্রান্ত বিষয়ে বিস্তারিত গবেষণার অভাব রয়েছে।

টিআইবি'র কর্মক্ষেত্রের পাঁচটি খাতের মধ্যে শিক্ষাখাত একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ খাত। এই খাতের সর্বোচ্চ পর্যায়ের প্রতিষ্ঠান হচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয়। ইতিপূর্বে টিআইবি 'বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে সুশাসনে চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের উপায়' এবং 'সরকারি বিশ্বদ্যালয়ে দুর্নীতি: স্বরূপ ও প্রতিকার' শীর্ষক দু'টি গবেষণা সম্পন্ন করেছে। এরই ধারাবাহিকতায় শিক্ষার সর্বোচ্চ স্তর হিসেবে সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার মান নিশ্চিতকরণে টিআইবি প্রভাষক নিয়োগ প্রক্রিয়ায় সুশাসনের চ্যালেঞ্জ চিহ্নিতকরণ ও উত্তরণের উপায় শীর্ষক বর্তমান গবেষণা কাজটি পরিচালনা করেছে।

১.২ গবেষণার উদ্দেশ্য

এই গবেষণার প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রভাষক নিয়োগে সুশাসনের চ্যালেঞ্জ চিহ্নিত করা ও তা উত্তরণে সুপারিশ প্রদান।

সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য হচ্ছে:

২ সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রভাষক নিয়োগ প্রক্রিয়ায় আইনি ও প্রাতিষ্ঠানিক সীমাবদ্ধতা চিহ্নিত করা;
৩ প্রভাষক নিয়োগ প্রক্রিয়ার বিভিন্ন ধাপে বিদ্যমান অনিয়ম ও দুর্নীতির ধরন ও প্রকৃতি চিহ্নিত করা, এবং
৪ প্রভাষক নিয়োগ প্রক্রিয়ায় অনিয়ম ও দুর্নীতি প্রতিরোধে সুপারিশ প্রদান করা।

১.৩ গবেষণার পরিধি

গবেষণায় শুধু প্রভাষক নিয়োগের বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, কারণ বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক হিসেবে নিয়োগের প্রবেশদ্বার হচ্ছে প্রভাষক এবং এই পদে সর্বোচ্চ সংখ্যক নিয়োগ দেওয়া হয়।

এই গবেষণায় নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে:

- প্রভাষক নিয়োগ সম্পর্কিত আইনি ও প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো;
- প্রভাষক নিয়োগ প্রক্রিয়ার ধাপ;
- প্রভাষক নিয়োগ কমিটি গঠন কাঠামো, সদস্য নির্বাচন বা অন্তর্ভুক্তির প্রক্রিয়া;
- প্রভাষক নিয়োগ কর্তৃপক্ষ ও অংশীজনের ভূমিকা

উল্লেখ্য প্রতিবেদনে অন্তর্ভুক্ত তথ্য, পর্যবেক্ষণ ও মন্তব্য গবেষণাভুক্ত সকল বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল বিভাগের নিয়োগ সংশ্লিষ্ট সকলের জন্য সমানভাবে প্রযোজ্য নয়।

---

[১৮] মানব জমিন, আগস্ট ২৫, ২০১৩।

[১৯] শরিফুজ্জামান, "অনিয়মের জালে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।" *প্রথম আলো*, ডিসেম্বর ২০, ২০১৪; *মানব জমিন*, আগস্ট ২৫, ২০১৩।

[২০] শরিফুজ্জামান এবং মোশতাক আহমেদ, "সরকারি আট বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়োগে অনিয়ম।", *প্রথম আলো*, মে ৩০, ২০১৩; *প্রথম আলো*, ডিসেম্বর ২০, ২০১৪; শরিফুজ্জামান, "অনিয়মের জালে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।"; *মানব জমিন*, আগস্ট ২৫, ২০১৩; Public univs recruit teachers, staff at whim, The NewAge, August 10, 2014;*বাংলাদেশ প্রতিদিন*, এপ্রিল ২৪, ২০১৪।

[২১] শরিফুজ্জামান এবং আহমেদ, "সরকারি আট বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়োগে অনিয়ম।"; *মানব জমিন*, আগস্ট ২৫, ২০১৩; শরিফুল হাসান, "অনিয়ম ও দুর্নীতির প্রমাণ মিললেও উপাচার্য বহাল।"*প্রথম আলো*, আগস্ট ২, ২০১৫; *বাংলাদেশ প্রতিদিন*, এপ্রিল ২৪, ২০১৪; *কালের কণ্ঠ*, ফেব্রুয়ারি ২০১৬।

[২২] বড়ুয়া, "শিক্ষকদের আসল যোগ্যতা দলীয় রাজনীতি।"

[২৩] শরিফুজ্জামান এবং আহমেদ, "সরকারি আট বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়োগে অনিয়ম।"; *মানব জমিন*, আগস্ট ২৫, ২০১৩; *কালের কণ্ঠ*, ফেব্রুয়ারি ২০১৬।

[২৪] শিক্ষক নিয়োগে রাজনীতি স্বজনপ্রীতি বিশ্ববিদ্যালয়, *কালের কণ্ঠ*, ফেব্রুয়ারি ২০১৬।

[২৫] শরিফুজ্জামান এবং আহমেদ, "সরকারি আট বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়োগে অনিয়ম।"; *প্রথম আলো*, ডিসেম্বর ২০, ২০১৪; শরিফুজ্জামান, "অনিয়মের জালে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।"; *মানব জমিন*, আগস্ট ২৫, ২০১৩; *যুগান্তর*, নভেম্বর ৬, ২০১৩।

[২৬] হাসান, "অনিয়ম ও দুর্নীতির প্রমাণ মিললেও উপাচার্য বহাল।"

১.৪ গবেষণা পদ্ধতি

এটি একটি গুণবাচক গবেষণা। এই গবেষণায় মুখ্য তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার, দলীয় আলোচনা ও গবেষণা সম্পর্কিত বিদ্যমান নথি পর্যালোচনার মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। এই গবেষণায় তথ্য সংগ্রহের জন্য চেকলিস্ট ব্যবহার করা হয়েছে।

১.৪.১ তথ্যের উৎস

এই গবেষণায় প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উভয় উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।

১.৪.১.১ পরোক্ষ তথ্য: পরোক্ষ তথ্যের উৎসের মধ্যে রয়েছে সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রভাষক নিয়োগ সংক্রান্ত বিধি-বিধান যেমন- সংশ্লিষ্ট অধ্যাদেশ, আইন ও বিধিমালা, প্রকাশিত বই, প্রবন্ধ, গবেষণা ও তদন্ত প্রতিবেদন, নথি, গণমাধ্যম ও ওয়েবসাইট ইত্যাদি।

১.৪.১.২ প্রত্যক্ষ তথ্য: গবেষণার বিষয়বস্তুর সাথে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সম্পৃক্ত ব্যক্তি কিংবা এসব বিষয়ে অবহিত বর্তমান ও সাবেক ব্যক্তিদের নিকট হতে প্রত্যক্ষ তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। তথ্যদাতাদের ধরনসমূহ হলো:

সারণি ১.১: প্রত্যক্ষ তথ্যদাতাদের ধরন

▪ ভাইস চান্সেলর ▪ প্রো-ভাইস চান্সেলর ▪ ডিন ▪ সিন্ডিকেট সদস্য ▪ বিভাগীয়/ইনস্টিটিউট প্রধান ▪ সাধারণ শিক্ষক, যথা- অধ্যাপক, সহযোগী অধ্যাপক, সহকারি অধ্যাপক, প্রভাষক	▪ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক কর্মকর্তা ▪ ইউজিসি'র চেয়ারম্যান ও সদস্যা ▪ বিশেষজ্ঞ শিক্ষক (এক্সটারনাল এক্সপার্ট) ▪ শিক্ষক সমিতির নেতা ▪ নিয়োগ পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী ▪ বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থী ▪ বিশ্ববিদ্যালয়ভিত্তিক ছাত্র সংগঠনের প্রতিনিধি ▪ সংশ্লিষ্ট গবেষক ও বিশেষজ্ঞ

১.৪.১.২.১ গবেষণার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় ও তথ্যদাতা নির্বাচন: সর্বশেষ প্রাপ্ত তথ্য মোতাবেক বাংলাদেশে কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে এমন মোট সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা ৩৭টি।[২৭] তার মধ্য থেকে এই গবেষণার জন্য মোট **১৩টি** বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় নির্বাচনের জন্য প্রথমে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে কয়েকটি ধরনে যথা - সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয় (১৫টি), বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (নয়টি), প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (সাতটি), কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় (চারটি) ও চিকিৎসা বিশ্ববিদ্যালয়ে (দুইটি) বিভক্ত করা হয়। এরপরে এই ধরনসমূহ থেকে বিশ্ববিদ্যালয় নির্বাচনের ক্ষেত্রে ভৌগলিক অবস্থান (ঢাকা ও ঢাকার বাইরে) ও প্রতিষ্ঠাকাল (নতুন - পুরাতন) ইত্যাদি বিবেচনা করা হয়।

সারণি ১.২: ধরনভেদে বিশ্ববিদ্যালয় নির্বাচন

বিশ্ববিদ্যালয়ের ধরন ও মোট সংখ্যা	মোট বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা	গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা
সাধারণ	১৫টি	আটটি
বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি	নয়টি	দুইটি
প্রকৌশল ও প্রযুক্তি	সাতটি	দুইটি
কৃষি	চারটি	একটি
অন্যান্য (মানব চিকিৎসা ও পশু চিকিৎসা)	দুইটি	-
মোট	৩৭টি	১৩টি

বিভিন্ন দলীয় রাজনৈতিক মতাদর্শ, দলের অনুসারী ও দল-নিরপেক্ষ শিক্ষক, নিয়োগ প্রক্রিয়ার সাথে সম্পৃক্ত ও অবহিত প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ব্যক্তি (বর্তমান ও অতীতের) তথ্যদাতাদের নিকট হতে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। উল্লেখ্য, তথ্যদাতা বাছাইকালে তথ্যদাতাদের বিশ্ববিদ্যালয়ভিত্তিক রাজনৈতিক মতাদর্শের বিষয়টির ভারসাম্য রক্ষার চেষ্টা করা হয়েছে।

---

[২৭] http://www.ugc.gov.bd/en/home/university/public/120. Accessed on September 6, 2016.

১.৪.২ তথ্যের যথার্থতা ও নির্ভরযোগ্যতা

প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রভাষক নিয়োগ সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহকালে একই বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতোপূর্বেকার (একই বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যান্য তথ্যদাতা) তথ্যদাতা হতে প্রাপ্ত তথ্যের মিল-অমিল, সত্যতা ও নির্ভরযোগ্য যাচাইয়ের চেষ্টা করা হয়েছে। তবে প্রতিবেদনে অন্তর্ভুক্ত সকল তথ্য গবেষণাভুক্ত সকল বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল বিভাগের জন্য সমানভাবে প্রযোজ্য নয়।

১.৪.২ গবেষণার সময় ও বিবেচ্য সময়সীমা

গবেষণাটি ২০১৬ সালের জানুয়ারি হতে ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত পরিচালনা করা হয়। এই গবেষণায় ২০০১ সাল থেকে ২০১৬ সালের নভেম্বর পর্যন্ত সময়ের মধ্যে সংঘঠিত নিয়োগ সংশ্লিষ্ট তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।

১.৫ প্রতিবেদন কাঠামো

প্রতিবেদনের প্রথম অধ্যায়ে গবেষণার প্রেক্ষাপট, যৌক্তিকতা, উদ্দেশ্য, গবেষণা পদ্ধতি ও পরিধি ইত্যাদি বিষয়ের ওপর আলোচনা করা হয়েছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচিতি, প্রভাষক নিয়োগের বিভিন্ন ধাপ ও প্রভাষক নিয়োগ সংক্রান্ত আইনি ও প্রাতিষ্ঠানিক সীমাবদ্ধতা। তৃতীয় অধ্যায়ে প্রভাষক নিয়োগে অনিয়ম ও দুর্নীতির ধরন ও প্রক্রিয়া এবং প্রভাষক নিয়োগে অনিয়ম-দুর্নীতির নিয়ামক সম্পর্কিত তথ্য তুলে ধরা হয়েছে। চতুর্থ অধায়ে গবেষণার সার্বিক পর্যবেক্ষণ (অনিয়ম-দুর্নীতির কারণ, ফলাফল ও প্রভাব বিশ্লেষণসহ) এবং সুপারিশ সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রভাষক নিয়োগে আইনি ও প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো এবং সীমাবদ্ধতা

প্রভাষক পদটি সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ পাওয়ার প্রথম ধাপ বা প্রবেশ পথ। প্রভাষক নিয়োগ সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে হলে প্রথমেই সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রভাষক নিয়োগ সংক্রান্ত আইন-কানুন, প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো, শিক্ষক-শিক্ষার্থীর অবস্থা, জবাবদিহিতা কাঠামো ইত্যাদি সম্পর্কে ধারণা থাকা প্রয়োজন। এই অধ্যায়ে দেশের সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা, শিক্ষার্থী ও শিক্ষক সংখ্যা, বিশ্ববিদ্যালয়ের ধরন, প্রভাষক নিয়োগ প্রক্রিয়ার বিভিন্ন ধাপ, শিক্ষক নিয়োগের আইনি কাঠামো, জবাবদিহিতা কাঠামো এবং প্রভাষক নিয়োগ সংক্রান্ত আইনি ও প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোয় বিদ্যমান সীমাবদ্ধতা ইত্যাদির ওপর আলোকপাত করা হয়েছে।

২.১ গবেষণার আওতাভুক্ত সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়

দেশের সবচেয়ে পুরাতন বিশ্ববিদ্যালয় হচ্ছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়[২৮] ও নতুন বিশ্ববিদ্যালয় হচ্ছে ‘বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মেরিটাইম ইউনিভার্সিটি’[২৯]। দেশের ৩২টি (জাতীয়, উন্মুক্ত ও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মেরিটাইম ইউনিভার্সিটি ব্যতিত) বিশ্ববিদ্যালয়ের মোট শিক্ষার্থী ২,৩১,৬৯০ জন যা দেশের সকল বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীর (বেসরকারিসহ) ৩৮.৭৯ শতাংশ। সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের মধ্যে ছাত্রী - ৭৩,১৯৪ জন (৩১.৫৯%) ও ছাত্র ১,৫৮,৪৯৬ (৬৮.৪১%)। সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে মোট শিক্ষক সংখ্যা হচ্ছে ১২,০৪৭ জন। শিক্ষকদের মধ্যে অধ্যাপক রয়েছেন ৩,৩৯৫ জন (২৮%), সহযোগী অধ্যাপক ১,৯৯৮ জন (১৭%), সহকারি অধ্যাপক ৩,৬৬৮ জন (৩০%), প্রভাষক ২,৮৩০ জন (২৪%) ও অন্যান্য ১৫৬ জন (১%)। শিক্ষকদের মধ্যে নারী শিক্ষক ২১.৪৪ শতাংশ ও পুরুষ শিক্ষক ৭৮.৫৬ শতাংশ।

সার্বিকভাবে সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক শিক্ষার্থীর অনুপাত ১:১৯ জন। বিশ্বদ্যিালগুলোর মধ্যে সবচেয়ে কম শিক্ষক-শিক্ষার্থীর অনুপাত হচ্ছে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ে (বিএসএমআরএমবি), ১:৪ জন এবং সর্বোচ্চ অনুপাত হচ্ছে বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়, রংপুরে, ১:৫২ জন।[৩০] বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মধ্যে শিক্ষার্থীর সংখ্যার দিক থেকে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় সবচেয়ে বড় যার শিক্ষার্থীর সংখ্যা হচ্ছে ৩০,০১৫ জন। অপরদিকে, শিক্ষক সংখ্যার বিচারে দেশের বড় বিশ্ববিদ্যালয় হচ্ছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। গবেষণার অন্তর্ভুক্ত ১৩টি সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে মোট শিক্ষক সংখ্যা হচ্ছে ৮,৫১৮ জন ও শিক্ষার্থীর সংখ্যা ১,৭৫,১২৯ জন। এই বিশ্বদ্যিালয়গুলোর শিক্ষক - শিক্ষার্থীর অনুপাত ১:২০[৩১] যা দেশের সকল সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষার্থী অনুপাতের কাছাকাছি।

সারণি ২.১: এক নজরে গবেষণার অন্তর্ভুক্ত সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়, শিক্ষক ও শিক্ষার্থী

বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম	শিক্ষার্থী ও শিক্ষক অনুপাত[৩২]	বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম	শিক্ষার্থী ও শিক্ষক অনুপাত[৩৩]
‘ক’ বিশ্ববিদ্যালয়	১:১৪	‘জ’ বিশ্ববিদ্যালয়	১:৩৬
‘খ’ বিশ্ববিদ্যালয়	১:২৭	‘ঝ’ বিশ্ববিদ্যালয়	১:১৯
‘গ’ বিশ্ববিদ্যালয়	১:২২	‘ঞ’ বিশ্ববিদ্যালয়	১:২৮
‘ঘ’ বিশ্ববিদ্যালয়	১:২২	‘ট’ বিশ্ববিদ্যালয়	১:১৫
‘ঙ’ বিশ্ববিদ্যালয়	১:৩৪	‘ঠ’ বিশ্ববিদ্যালয়	১:১৪
‘চ’ বিশ্ববিদ্যালয়	১:১৬	‘ড’ বিশ্ববিদ্যালয়	১:১৪
‘ছ’ বিশ্ববিদ্যালয়	১:২৬	**মোট**	১:২০

---

[২৮] এটি ১৯২১ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়।

[২৯] এটি BSMRMU, Act No. 47 of 2013 আইন মোতাবেক প্রতিষ্ঠিত হয়।

[৩০] প্রাগুক্ত।

[৩১] *বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন*, *৪১তম বার্ষিক প্রতিবেদন*, ২০১৪, পৃ. ১৪৭।

[৩২] প্রাগুক্ত, ২৬।

[৩৩] প্রাগুক্ত, ২৬।

২.২ প্রভাষক নিয়োগের আইনি ও জবাবদিহিতা কাঠামো

সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় বলা হলেও এই বিশ্ববিদ্যালয়গুলো মূলত স্বায়ত্বশাসিত। প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয় স্ব-স্ব আইন বা নিয়ম দ্বারা পরিচালিত হয়। একইভাবে সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে প্রভাষক নিয়োগের কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রেও নিজ-নিজ নিয়ম অনুসরণ করা হয়। এ কারণে প্রভাষক নিয়োগ প্রক্রিয়া ও নিয়োগ প্রার্থীর যোগ্যতার শর্তে বিশ্ববিদ্যালয়ভেদে ভিন্নতা রয়েছে। প্রভাষক নিয়োগের সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহ বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর সংশ্লিষ্ট অধ্যাদেশ, আইন এবং বিধিমালায় উল্লেখ রয়েছে। যেমন - নিয়োগের জন্য চাহিদা কে পেশ করবেন, কে তা অনুমোদন দেবেন, নিয়োগের শর্ত কীভাবে নির্ধারণ করা হবে, কে তা তৈরি করবেন, কে তা অনুমোদন করবেন, নিয়োগ বোর্ডের কাঠামো কেমন হবে, উক্ত বোর্ডে কে সভাপতিত্ব করবেন, উক্ত বোর্ডের বিশেষজ্ঞ কীভাবে নির্বাচিত হবেন, কারা উক্ত বোর্ড গঠন অনুমোদন করবেন, নিয়োগ বোর্ডের কোরাম কীভাবে হবে, নিয়োগ বোর্ডের মেয়াদ কতদিন হবে, কারা নিয়োগের ক্ষেত্রে চূড়ান্ত অনুমোদন করবেন ইত্যাদি বিষয় সংশ্লিষ্ট বিশ্বদ্যিালয়ের অধ্যাদেশ, আইন এবং বিধিমালায় উল্লেখ রয়েছে।

প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়েই উপাচার্য অথবা উপ-উপাচার্যর সভাপতিত্বে প্রভাষক নিয়োগ সম্পন্ন হয়। এক্ষেত্রে উপাচার্য/উপ-উপাচার্য নিয়োগের ক্ষেত্রে মুখ্য ভূমিকা পালন করে থাকেন। প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়েই দেখা গেছে উপাচার্যর অনুমতি ছাড়া কোনো নিয়োগ সম্পন্ন হয় না। প্রভাষক নিয়োগে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে সর্বোচ্চ তথা চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী কর্তৃপক্ষ হলো প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেট। কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে এই সিন্ডিকেটের নাম আলাদা হলেও এর কার্যক্রম একই রকম। বিশ্ববিদ্যালয়ের যেকোনো নিয়ম তৈরি বা পরিবর্তনের জন্য সিন্ডিকেটের অনুমোদন প্রয়োজন হয়। সিন্ডিকেট নিয়োগ কমিটির যেকোনো সুপারিশ গ্রহণ বা বাতিল করতে পারে। ফলে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে নিয়োগের ক্ষেত্রে কার্যত সরাসরি তেমন কোনো জবাবদিহিতা করতে হয় না। সিন্ডিকেট নিয়োগ বোর্ডের কোনো সিদ্ধান্তে দ্বিমত পোষণ করলে তারা বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলরের নিকট তা পেশ করতে পারেন। চ্যান্সেলর এ বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

বিশ্ববিদ্যালয়গুলো বাজেটের জন্য 'বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন' (ইউজিসি) এর নিকট দায়বদ্ধ থাকে। নিয়ন্ত্রণকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে প্রভাষক নিয়োগে ইউজিসি'র তেমন কোনো ভূমিকা নেই। রাজস্ব খাতের ব্যয় হতে প্রভাষক নিয়োগের জন্য ইউজিসি'র কাছ থেকে প্রাক-অনুমোদন নিতে হয়। ইউজিসি প্রশাসন থেকে প্রেরিত আবেদনের প্রেক্ষিতে পদের বিপরীতে সরকারের রাজস্ব বাজেট যাচাই করে নতুন পদসংখ্যা অনুমোদন দেয়। বাজেট স্বল্পতা থাকলে অনেক ক্ষেত্রে ইউজিসি পদসংখ্যা কমিয়ে দিতে পারে। অস্থায়ী নিয়োগের ক্ষেত্রে ইউজিসির কোনো করণীয় থাকে না। বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়োগের ক্ষেত্রে কোনো অনিয়ম-দুর্নীতি সংগঠিত হলে ইউজিসি অনুসন্ধান করে তার প্রতিবেদন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে জমা দিতে পারে। তবে অনিয়ম-দুর্নীতির বিরুদ্ধে শৃঙ্খলাভঙ্গজনিত কোনো পদক্ষেপ নেওয়ার ক্ষমতা ইউজিসি'র নেই। প্রভাষক নিয়োগের ক্ষেত্রে ইউজিসি সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় ও সরকারের মধ্যে অনেকটা সমন্বয়কের ভূমিকা পালন করে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর যেকোনো কাজের জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয় জবাবদিহি চাইতে পারে, কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়গুলো স্বায়ত্ত্বশাসিত হওয়ায় মন্ত্রণালয় থেকে এসব ক্ষেত্রে সাধারণত কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করে না।

২.৩ প্রভাষক নিয়োগের বিভিন্ন ধাপ

প্রভাষক নিয়োগের ক্ষেত্রে সাধারণত কয়েকটি ধাপ অনুসরণ করতে হয়। নিম্নে নিয়োগের ধাপগুলো উল্লেখ করা হলো:

২.৩.১ ধাপ ১: নিয়োগ চাহিদা

বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্গানোগ্রামে উল্লেখিত পদ এবং নতুন পদ সৃষ্টি করে নিয়োগের ক্ষেত্রে কিছুটা পার্থক্য লক্ষ করা যায়। কোনো নতুন পদ সৃষ্টি করে নিয়োগ দিতে হলে পূর্ব থেকে ইউজিসি'র অনুমোদন নিতে হয়। নতুন পদ সৃষ্টি করে প্রভাষক নিয়োগের ক্ষেত্রে নিয়ম হচ্ছে সংশ্লিষ্ট বিভাগের সমন্বয় ও উন্নয়ন কমিটি (কো-অর্ডিনেশন অ্যাণ্ড ডেভেলপমেন্ট কমিটি - সিঅ্যান্ডডি কমিটি) বা প্ল্যানিং কমিটি[৩৪] তার ছাত্র-শিক্ষক অনুপাত, কোর্স ও ক্লাসের সংখ্যা, শিক্ষকদের পর্যাপ্ততা বা অপর্যাপ্ততা ও গবেষণার তত্ত্বাবধান ইত্যাদি বিষয় যাচাই করে নিয়োগের চাহিদা সংশ্লিষ্ট ডিনের সুপারিশক্রমে ডিন কমিটিতে প্রেরণ করে। ডিন কমিটি তা

---

[৩৪] বিশ্ববিদ্যালয় ভেদে নিয়োগের চাহিদা তৈরির দায়িত্ব যে কমিটির ওপরে থাকে তার নামে পার্থক্য রয়েছে, যেমন - কোনো কোনো বিশ্বদ্যিালয়ে সিঅ্যান্ডডি কমিটি এবং কোনো কোনো বিশ্বদ্যিালয়ে এর নাম প্লানিং কমিটি

যাচাই-বাছাই করে অনুমোদন দিয়ে আবার সংশ্লিষ্ট বিভাগে পাঠায়। সংশ্লিষ্ট বিভাগ উক্ত চাহিদাপত্র রেজিস্ট্রার বরাবর প্রেরণ করে। রেজিস্ট্রার কার্যালয় উক্ত চাহিদাপত্র যাচাই-বাছাইয়ের জন্য অ্যাকাডেমিক কাউন্সিলে পাঠায়।

২.৩.২ ধাপ ২: পদসংখ্যা অনুমোদন

অ্যাকাডেমিক কাউন্সিল উক্ত চাহিদা যাচাই করে নিয়োগের জন্য অনুমোদন দেয়। এরপরে উক্ত পদ অনুমোদনের জন্য ইউজিসিতে প্রেরণ করা হয়। শূন্য পদে প্রভাষক নিয়োগের ক্ষেত্রে যেহেতু পূর্ব থেকে ডিন এবং ইউজিসি'র অনুমোদন থাকে সেহেতু পরবর্তীতে আর ডিন কমিটি ও ইউজিসি'র অনুমোদনের প্রয়োজন হয় না।

২.৩.৩ ধাপ ৩: নিয়োগের শর্ত নির্ধারণ ও বিজ্ঞপ্তি

নিয়োগের তৃতীয় পর্যায়ে সিন্ডিকেট কর্তৃক নিয়োগের শর্ত নির্ধারণ করা হয়। নিয়োগের শর্তের ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মধ্যে কোনো মিল নেই। সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয় তাদের প্রয়োজন মতো নিয়োগের শর্ত তৈরি করে থাকে। এরপর রেজিস্ট্রার কার্যালয় কর্তৃক বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়। উক্ত বিজ্ঞপ্তির ক্ষেত্রে বহুল প্রচারিত দৈনিক পত্রিকায় কমপক্ষে একুশ দিন সময় উল্লেখ করে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের নিয়ম রয়েছে। কোনো কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে এই নিয়ম কম-বেশি হয়ে থাকে।

চিত্র ২.১: নিয়োগের ধাপ

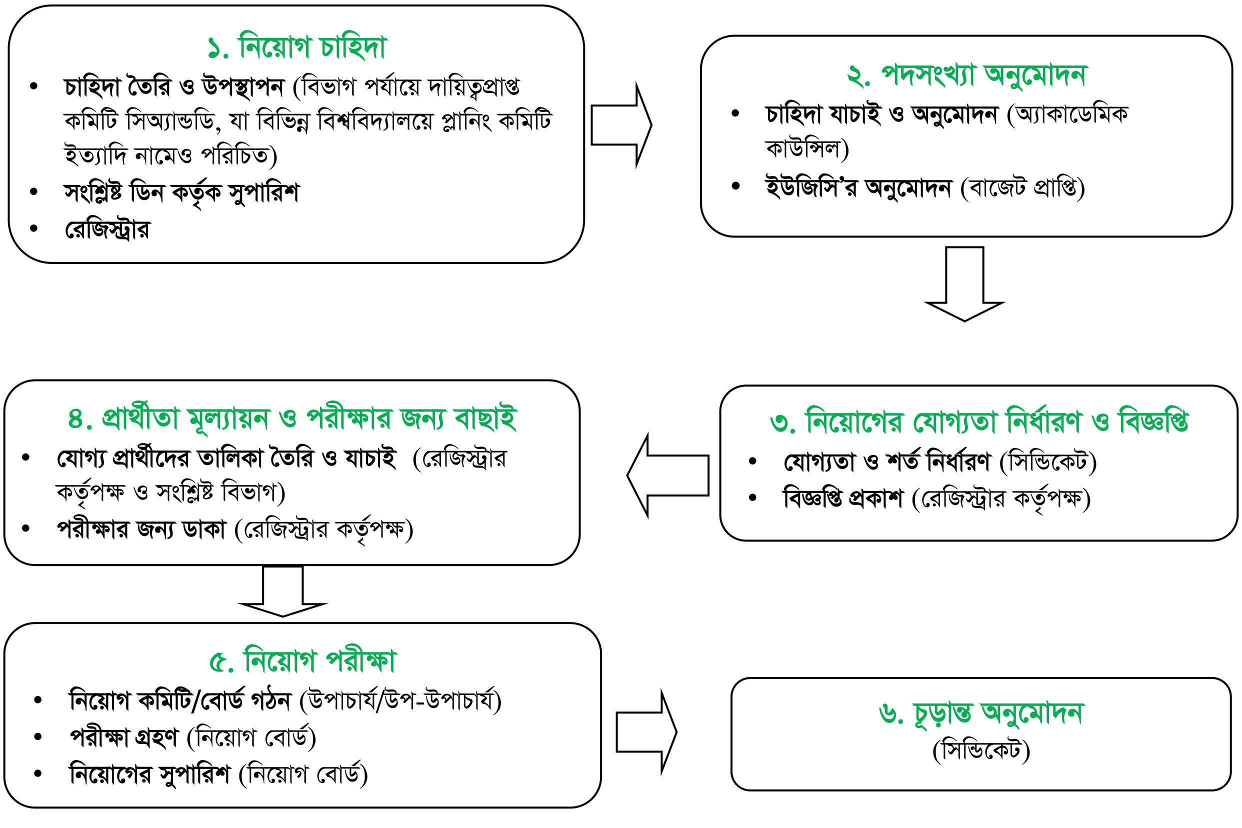
১. নিয়োগ চাহিদা
চাহিদা তৈরি ও উপস্থাপন (বিভাগ পর্যায়ে দায়িত্বপ্রাপ্ত কমিটি সিঅ্যান্ডডি, যা বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে প্ল্যানিং কমিটি ইত্যাদি নামেও পরিচিত)
সংশ্লিষ্ট ডিন কর্তৃক সুপারিশ
রেজিস্ট্রার
২. পদসংখ্যা অনুমোদন
চাহিদা যাচাই ও অনুমোদন (অ্যাকাডেমিক কাউন্সিল)
ইউজিসি'র অনুমোদন (বাজেট প্রাপ্তি)
৩. নিয়োগের যোগ্যতা নির্ধারণ ও বিজ্ঞপ্তি
যোগ্যতা ও শর্ত নির্ধারণ (সিন্ডিকেট)
বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ (রেজিস্ট্রার কর্তৃপক্ষ)
৪. প্রার্থীতা মূল্যায়ন ও পরীক্ষার জন্য বাছাই
যোগ্য প্রার্থীদের তালিকা তৈরি ও যাচাই (রেজিস্ট্রার কর্তৃপক্ষ ও সংশ্লিষ্ট বিভাগ)
পরীক্ষার জন্য ডাকা (রেজিস্ট্রার কর্তৃপক্ষ)
৫. নিয়োগ পরীক্ষা
নিয়োগ কমিটি/বোর্ড গঠন (উপাচার্য/উপ-উপাচার্য)
পরীক্ষা গ্রহণ (নিয়োগ বোর্ড)
নিয়োগের সুপারিশ (নিয়োগ বোর্ড)
৬. চূড়ান্ত অনুমোদন
(সিন্ডিকেট)

২.৩.৪ ধাপ ৪: প্রার্থীতা মূল্যায়ন ও পরীক্ষার জন্য বাছাই

বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের পর রেজিস্ট্রার কার্যালয় কর্তৃক প্রার্থীদের যোগ্যতা অনুসারে তালিকা তৈরি করা হয়। তালিকায় প্রার্থীদের শিক্ষাগত যোগ্যতা ও ফলাফল, চাকরির অভিজ্ঞতা, প্রকাশনাসহ কী কী যোগ্যতা রয়েছে, কী কী নথিপত্র সরবরাহ করা হয়েছে, কোন কোন প্রার্থী নিয়োগের শর্ত পূরণ করেছে, ইত্যাদি তথ্য উল্লেখ করা হয়। উক্ত তালিকা ও সংশ্লিষ্ট নথিপত্র রেজিস্ট্রার কার্যালয় থেকে সংশ্লিষ্ট বিভাগে পাঠানো হয় প্রার্থীতা যাচাইয়ের জন্য। সংশ্লিষ্ট বিভাগ প্রার্থীতা বাছাই করে রেজিস্ট্রার বরাবর প্রেরণ করে। রেজিস্ট্রার কার্যালয় উপাচার্য/উপ-উপাচার্য'র (নিয়োগ বোর্ডের সভাপতি) অনুমতি সাপেক্ষে মৌখিক (বা প্রযোজ্য ক্ষেত্রে লিখিত) পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করার জন্য প্রার্থীদের নিকট চিঠি পাঠায়। কোনো কোনো বিশ্বদ্যিালয়ে শুধু ডাকযোগে মৌখিক

পরীক্ষার জন্য চিঠি পাঠানো হয়। কোনো কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্যুরিয়ারের মাধ্যমে চিঠি পাঠানো, মোবাইলের মাধ্যমে ফোন করা বা বার্তা পাঠানো এবং ই-মেইলের মাধ্যমেও পরীক্ষার জন্য অবহিত করা হয়।

২.৩.৫ ধাপ ৫: নিয়োগ পরীক্ষা

চাকরি প্রার্থীদের নিয়োগ পরীক্ষার জন্য ডাকার পরে সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য বা উপ-উপাচার্য কর্তৃক নিয়োগ কমিটি/বোর্ড গঠন করা হয়। অর্থাৎ নিয়োগ বোর্ডে কে কে থাকবেন তা নির্ধারণ করা হয়। এক্ষেত্রে বিভাগীয় প্রধান ও ডিনের সাথেও আলোচনা করা হয়। বিশেষজ্ঞ নিয়োগের বিষয়টি পূর্ব থেকেই দুই বা তিন বছরের জন্য সিন্ডিকেট কর্তৃক নির্ধারিত থাকে। কখনও কখনও প্রয়োজন অনুসারে বিশেষজ্ঞ পরিবর্তনও করা হয়। সাধারণত প্রভাষক নিয়োগ বোর্ডে মোট পাঁচজন সদস্য থাকেন। গবেষণাভুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর নিয়োগ বোর্ডের মধ্যে কোনোটিতে এগারো জন, কোনোটিতে ছয়/সাতজন এবং কোনোটিতে চারজন সদস্য রয়েছে। নিয়োগ বোর্ডে সাধারণত উপাচার্য/উপ-উপাচার্য, বিভাগীয় প্রধান, সংশ্লিষ্ট অনুষদের ডিন ও দুই বা তিনজন বিশেষজ্ঞ থাকেন। বেশিরভাগ বিশ্ববিদ্যালয়ে বিশেষজ্ঞ বাইরের বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠান থেকে নির্ধারণ করা হলেও কোনো কোনো ক্ষেত্রে নিজস্ব বিশ্ববিদ্যালয় থেকেও নির্ধারণ করা হয়। নিয়োগ বোর্ডে কারা থাকবেন তা নির্ভর করে উপাচার্য বা উপ-উপাচার্য ও সিন্ডিকেটের পছন্দের ওপর। বেশিরভাগ বিশ্ববিদ্যালয়ে ডিন জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নিয়োগ দেওয়া হলেও কোনো কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে নির্বাচনের মাধ্যমে ডিন নিয়োগ দেওয়া হয়। নিয়োগ বোর্ড গঠন হলে বোর্ডের সদস্যদের নিকট নিয়োগ পরীক্ষার জন্য তালিকাভুক্ত প্রার্থীদের যোগ্যতা সম্পর্কে ধারণা নেওয়ার জন্য সকল নথিপত্র পাঠিয়ে দেওয়া হয়। এরপরে নিয়োগের জন্য পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মধ্যে ১২টিতে নিয়োগের জন্য শুধু মৌখিক পরীক্ষা নেওয়া হয়। মৌখিক পরীক্ষার পরে নিয়োগ কমিটি কর্তৃক প্রার্থী বাছাই করে চূড়ান্ত করার জন্য নিয়োগের সুপারিশ করা হয়।

২.৩.৬ ধাপ ৬: চূড়ান্ত অনুমোদন

সুপারিশকৃত প্রার্থীদের নিয়োগ চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য সিন্ডিকেট বরাবর প্রেরণ করা হয়। সিন্ডিকেট নিয়োগ অনুমোদন চূড়ান্ত করলে সংশ্লিষ্ট প্রার্থীদেরকে প্রভাষক হিসেবে নিয়োগপত্র প্রেরণ করা হয়।

২.৪ প্রভাষক নিয়োগের ক্ষেত্রে আইনি ও প্রাতিষ্ঠানিক সীমাবদ্ধতা

২.৪.১ নিয়োগের বিধিমালায় নিয়োগ সংশ্লিষ্ট বিষয়ের অনুপস্থিতি

কী প্রক্রিয়ায় নিয়োগ সম্পন্ন হবে অর্থাৎ মৌখিক পরীক্ষা হবে নাকি লিখিত পরীক্ষা হবে, কীভাবে নম্বর দেওয়া হবে অর্থাৎ অ্যাকাডেমিক ফলাফলের জন্য কত শতাংশ নম্বর থাকবে, মৌখিক পরীক্ষার জন্য কত শতাংশ নম্বর থাকবে, বোর্ডের সদস্যদের জন্য মৌখিক পরীক্ষা যাচাইয়ের জন্য প্রশ্নের কাঠামো, নম্বর দেওয়ার পদ্ধতি ও কাঠামো ইত্যাদি বিষয়গুলো সম্পর্কে কোনো নিয়ম-কানুন নিয়োগ বিধিমালাগুলোতে উল্লেখ নেই। এসব বিষয়ে কোনো স্বচ্ছ, সুনির্দিষ্ট ও পূর্ণাঙ্গ নীতিমালা বা নির্দেশিকা নেই। এর ফলে নিয়োগের ক্ষেত্রে সুবিধামাফিক নিয়ম-কানুন তৈরির ঝুঁকি তৈরি হয়। এছাড়া কোনো কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে স্বার্থের দ্বন্দ্ব থাকতে পারে এমন ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞের উপস্থিতির ব্যাপারে কোনো নির্দেশনা নেই। ফলে প্রার্থীর আত্মীয় হয়েও নিয়োগ বোর্ডে বিশেষজ্ঞ হিসেবে উপস্থিত থাকা এবং পক্ষপাতিত্ব করে নিয়োগ দানের সুযোগ সৃষ্টি হয়। আবার বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর নিয়োগ সংশ্লিষ্ট বিধিমালায় অনিয়ম-দুর্নীতির জন্য কার্যকর শাস্তির বিষয়েও উল্লেখ নাই ।

২.৪.২ নিয়োগের চাহিদা তৈরি ও যাচাইয়ের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধতা

বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর বিভাগ কর্তৃক প্রভাষক নিয়োগের চাহিদা সঠিকভাবে তৈরি এবং তা উপস্থাপন করছে কিনা সে বিষয়ে জবাবদিহিতার ব্যবস্থা নেই। কোনো বিভাগে শিক্ষকের পদ শূন্য থাকলেও দিনের পর দিন নিয়োগের চাহিদা না দিলে কিংবা ইচ্ছামাফিক সময়ে নিয়োগের চাহিদা উপস্থাপন করলে সেজন্য কোনো বিভাগকে জবাবদিহিতার আওতায় আনার কোনো ব্যবস্থা নাই। একইভাবে ক্ষেত্র বিশেষে কোনো বিভাগে আদৌ নতুন শিক্ষক নিয়োগের প্রয়োজনীয়তা আছে কিনা তা বিবেচনা না করে বিশ্ববদ্যালয় কর্তৃপক্ষ নিজেদের ইচ্ছামতো শিক্ষক নিয়োগের চাপ সৃষ্টি করার উদাহরণ থাকলেও এসবের জন্য কোনো কার্যকর জবাবদিহির ব্যবস্থা নাই। ফলে বিভাগ কর্তৃক ইচ্ছামাফিক নিয়োগের চাহিদা উপস্থাপন করা কিংবা উপস্থাপন না করা এবং বিপরীতভাবে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের পক্ষ থেকেও শিক্ষক নিয়োগের প্রয়োজনীয়তা যাচাই না করে নিয়োগ চাপিয়ে দেওয়ার সুযোগ সৃষ্টি হয়।

২.৪.৩ সিন্ডিকেট কর্তৃক ইচ্ছামাফিক নিয়োগের যোগ্যতা নির্ধারণ ও নিয়োগ কমিটি গঠনের সুযোগ

প্রভাষক নিয়োগের যোগ্যতা নির্ধারণের ক্ষমতা সিন্ডিকেটের হাতে। সরকারি বিশ্ববিদ্যালগুলোর আইন পর্যালোচনা করে দেখা গেছে, সিন্ডিকেটে ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলের সমর্থনকারী সদস্য বা মনোনীত সংখ্যাগরিষ্ঠ সংখ্যাক সদস্য অন্তর্ভুক্তির সুযোগ বিদ্যমান রয়েছে। যেমন - একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে মোট ২৩ জন সিন্ডিকেট সদস্যের মধ্যে ১৭ জন মনোনীত সদস্য। এছাড়াও উপাচার্য ও উপ-উপাচার্য এবং ডিনদের মধ্যেও একই রাজনৈতিক মতাদর্শের অনুসারী হওয়ার সুযোগ রয়েছে। এভাবে সিন্ডিকেটের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের অনুমোদনের মাধ্যমে ইচ্ছামাফিক নিয়োগের যোগ্যতা নির্ধারণ ও নিয়োগ বোর্ড গঠন বা পুনর্গঠনের সুযোগ থাকে। যেমন - ইচ্ছামাফিক সিজিপিএ হ্রাস-বৃদ্ধি ও নির্দিষ্ট বিষয়ে প্রকাশনা থাকা বা উচ্চতর ডিগ্রি (এমফিল/পিএইচডি) থাকলে তাদের প্রাধান্য দেওয়ার মতো শর্তও সিন্ডিকেট কর্তৃক অনুমোদন দেওয়ার উদাহরণ রয়েছে। নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিতে বর্ণিত এসব শর্ত প্রভাষক নিয়োগে অনিয়ম ও দুর্নীতির সুযোগ/ক্ষেত্র সৃষ্টিকারী উপাদান হিসেবে কাজ করে।

একইভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্য দ্বারা নিয়োগ বোর্ডে তাদের মতাদর্শের অনুসারীদের বা পছন্দের ব্যক্তিদের দ্বারা গঠন করার সুযোগ রয়েছে। গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে বারোটিতেই নিয়োগ বোর্ডে মনোনীত সদস্যদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা প্রত্যক্ষ করা যায়। সকল নিয়োগ বোর্ডের সভাপতি উপাচার্য বা উপ-উপাচার্য যিনি সাধারণত ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলের সমর্থক হন। এছাড়া নিয়োগ বোর্ডে যারা থাকেন তাদের মধ্যে সিন্ডিকেট মনোনীত প্রতিনিধি ও সিন্ডিকেট মনোনীত বিশেষজ্ঞগণেরও একই রাজনৈতিক মতাদর্শের অনুসারী হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। আবার ইনস্টিটিউটের ক্ষেত্রেও বোর্ড অব গভর্নর দ্বারা মনোনীত প্রতিনিধিগণেরও একই রাজনৈতিক মতাদর্শের হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। একইভাবে যেসব বিশ্ববিদ্যালয়ে ডিন নির্বাচিত হন যেসব বিশ্ববিদ্যালয়ে ডিন একই রাজনৈতিক মতাদর্শের হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। কারণ রাজনৈতিক মতাদর্শ অনুসারে ডিন নির্বাচনে মনোনয়ন প্রদান করা হয়। এভাবে নিয়োগ বোর্ডের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যগণ ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক মতাদর্শের অনুসারী বা সমর্থক হওয়ার সম্ভাবনা থাকায় একই রাজনৈতিক মতাদর্শের অনুসারী প্রার্থীদের বা তাদের পছন্দের (আত্মীয় বা একই এলাকার) প্রার্থীদের নিয়োগের ক্ষেত্রে পক্ষপাতিত্ব করার সুযোগ সৃষ্টি হয়।

গবেষণাভুক্ত ছয়টি সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঁচজন সদস্যদের মধ্যে চারজন অথবা তিনজনের একই রাজনৈতিক মতাদর্শের অনুসারী হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। অন্য দু'টি সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে মোট চারজন ও ছয়জনের মধ্যে যথাক্রমে তিনজন ও চারজন সদস্যের একই রাজনৈতিক মতাদর্শের অনুসারী হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে (সারণি ২.১ লক্ষণীয়)।

সারণি ২.২: রাজনৈতিক বিবেচনায় মনোনীত ব্যক্তিদের নিয়োগ বোর্ড/নির্বাচন কমিটিতে অন্তর্ভুক্তির ঝুঁকির চিত্র

বিশ্ববিদ্যালয়ের ধরন	নিয়োগ বোর্ডের সদস্যসংখ্যা	নিয়োগ বোর্ডের সদস্যদের পদ	একই রাজনৈতিক মতাদর্শ/ব্যক্তিগত সম্পর্ক রয়েছে এমন সদস্য অন্তর্ভুক্তির সুযোগ
সাধারণ (৩টি)	৫ জন	উপাচার্য/উপ-উপাচার্য, বিভাগীয় প্রধান ও সিন্ডিকেট মনোনীত প্রতিনিধি, সিন্ডিকেট কর্তৃক মনোনীত বিশেষজ্ঞ এবং সরকার মনোনীত প্রতিনিধি	৪ জন
সাধারণ (১টি)	৪ জন	উপ-উপাচার্য, বিভাগীয় প্রধান ও সিন্ডিকেট মনোনীত দু'জন বিশেষজ্ঞ	৩ জন
সাধারণ (১টি)	৬ জন	উপাচার্য, ট্রেজারার, ডিন, বিভাগীয় প্রধান ও সিন্ডিকেট মনোনীত দু'জন বিশেষজ্ঞ	৪ জন
সাধারণ - (৩টি), বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি (১টি) এবং প্রকৌশল ও প্রযুক্তি- (১টি) ও কৃষি - (১টি)	৫ জন	উপাচার্য, ডিন, বিভাগীয় প্রধান/চেয়ারম্যান, দু'জন বিশেষজ্ঞ	৩ জন
বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি (১টি)	৭/৮ জন	উপাচার্য, প্রোউপাচার্য (যদি থাকে), ডিন, বিভাগীয় প্রধান, চ্যান্সেলর মনোনীত বিশেষজ্ঞ, রিজেন্ট (সিন্ডিকেট) বোর্ড কর্তৃক মনোনীত দুইজন বিশেষজ্ঞ	৫/৬ জন
প্রকৌশল ও প্রযুক্তি (১টি)	১১ জন	উপাচার্য, সকল ডিন (৫ জন), বিভাগীয় চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষার ডিজি, সিন্ডিকেট কর্তৃক মনোনীত দু'জন সদস্য, উপাচার্য মনোনীত একজন বিশেষজ্ঞ	৫ জন

আবার দুটি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি এবং প্রযুক্তি ও প্রকৌশল ও একটি কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঁচজনের মধ্যে তিনজন সদস্যের একই রাজনৈতিক মতাদর্শের সমর্থক বা অনুসারী হওয়ার সুযোগ রয়েছে। অন্য একটি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্বদ্যিালয়ের নিয়োগ বোর্ডে মোট সাত/আটজন সদস্য থাকেন যাদের মধ্যে পাঁচ/ছয়জনই একই রাজনৈতিক মতাদর্শের হতেপারেন। তবে গবেষণাভুক্ত একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়োগ বোর্ডে মোট এগারো জন সদস্যদের মধ্যে সকল ডিন (পাঁচজন) উপস্থিত থাকায় এখানে সংখ্যাগরিষ্ঠ সংখ্যক সদস্যের একই রাজনৈতিক মতাদর্শের হওয়ার সুযোগ কম। আবার নিয়োগের সাথে সংশ্লিষ্ট কমিটিগুলো এক থেকে দু'বছর পর্যন্ত কার্যকর থাকে। কোনো কোনো কমিটি দু'বছরের জায়গায় তিনবছর বা তার অধিক সময় ধরে নিয়োগ কমিটিতে যুক্ত থাকে। বিষয়টি সম্পর্কে চাকরি প্রার্থীরা পূর্ব থেকে অবহিত থাকায় কমিটির সদস্যদেরকে নানাভাবে প্রভাবিত করার সুযোগ থাকে। নিয়োগ বোর্ডের সদস্যগণ বা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ না জানলেও প্রার্থীরা একদিকে যেমন নিজেদের জন্য সুপারিশ করে তেমনি অন্য প্রার্থীরা কোন মতাদর্শের সমর্থক বা অনুসারী কিংবা তার কোনো আত্মীয় কোন রাজনৈতিক মতাদর্শের সমর্থক, কিংবা তারা বিপক্ষ রাজনৈতিক দলের সক্রিয় কর্মী কিনা ইত্যাদি তথ্য দিয়ে অন্য প্রার্থীদের নিয়োগ না দিতে সুপারিশ করার সুযোগ পায়।

২.৪.৪ প্রভাষক নিয়োগে উপাচার্য ও উপ-উপাচার্যের ভূমিকা

নিয়োগ বোর্ডের সভাপতিত্ব করেন উপাচার্য বা উপ-উপাচার্য। সভাপতিত্ব যিনিই করুন না কেন উপাচার্য'র (সিন্ডিকেট সভাপতি) সমর্থন ছাড়া বিশ্বদ্যিালয়ে কোনো নিয়োগ সম্ভব নয়। বেশিরভাগ বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্য নিয়োগের কোনো নীতিমালা নেই। কোনো কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে প্যানেলের মাধ্যমে উপাচার্য নিয়োগের নিয়ম অধ্যাদেশে উল্লেখ থাকলেও সাম্প্রতিককালে তা অনুসরণের ঘটনা বিরল। মূলত সরকারের উচ্চ পর্যায়ের নীতিনির্ধারক ও ক্ষমতাসীন প্রভাবশালী নেতাদের একাংশের সাথে যোগাযোগ ও তাদের সমর্থন সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্য ও উপ-উপাচার্য পদে নিয়োগ প্রাপ্তির মূল মাধ্যম। গবেষণার আওতাভুক্ত একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান উপাচার্য সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের সরকার সমর্থক শিক্ষকদের মধ্যে কনিষ্ঠ হওয়া সত্ত্বেও সরকার দলীয় একজন প্রভাবশালী জনপ্রতিনিধির সাথে তাঁর যোগাযোগ ও উক্ত নেতার প্রভাবে তিনি উপাচার্য হন বলে অভিমত রয়েছে।[৩৫] এভাবে উপাচার্য ও উপ-উপাচার্য নিয়োগের পরে পদ টিকিয়ে রাখতে নিজেদের অনুসারী ও ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক মতাদর্শের সমর্থক তথা 'ভোটার' নিয়োগের চেষ্টা করেন।

২.৪.৫ মৌখিক পরীক্ষার সুনির্দিষ্ট ও স্বচ্ছ কাঠামো না থাকা

মৌখিক পরীক্ষার জন্য সুনির্দিষ্ট কোনো কাঠামো নেই। কোন কোন বিষয়কে নিয়োগের ক্ষেত্রে গুরুত্ব দেওয়া হবে, কীভাবে প্রশ্ন করা হবে, ইস্যুভিত্তিক প্রশ্ন করা হবে কিনা, নম্বর দেওয়ার কাঠামো ও প্রক্রিয়া কী হবে, সকল সদস্যগণের নম্বর দেওয়ার ব্যবস্থা থাকবে কিনা, উপস্থাপনা, মৌখিক পরীক্ষা ও অ্যাকাডেমিক ফলাফলের ক্ষেত্রে কীভাবে (কোন ক্ষেত্রে কত শতাংশ নম্বর থাকবে) নম্বর দেওয়া হবে ইত্যাদি বিষয়ে কোনো কাঠামো নাই। ফলে অপ্রাসঙ্গিক প্রশ্ন করা, পছন্দের প্রার্থীকে সহজ প্রশ্ন করা এবং অন্যদের ভয় পাইয়ে দেওয়াসহ নানা অনিয়মের সুযোগ সৃষ্টি হয়।

২.৪.৬ নিয়োগ পরীক্ষায় অংশগ্রহণের সুযোগ হতে বঞ্চিত করা

নিয়োগ পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য আমন্ত্রণ জানিয়ে চাকরিপ্রার্থীদের নিকট সরকারি ডাকযোগে যে চিঠি পাঠানো হয় তা নিয়োগ পরীক্ষার পূর্বে পৌছানো নিশ্চিত না করার জন্য জবাবদিহিতার ব্যবস্থা নাই।

২.৪.৭ পরীক্ষার ফলাফল যাচাই ও অভিযোগ দায়েরের সুযোগ না থাকা

প্রার্থী কর্তৃক নিয়োগ পরীক্ষার ফলাফল যাচাইয়ের জন্য আবেদন করার কোনো সুযোগ বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে নেই। ফলে নিয়োগ বোর্ডের সদস্যদের ইচ্ছামাফিক সিদ্ধান্ত নেওয়া এবং নিয়োগে পক্ষপাতিত্ব করার ব্যাপারে কোনো জবাবদিহিতা করতে হয় না। অন্যদিকে, প্রভাষক নিয়োগে পক্ষপাতিত্ব করা বা অনিয়ম-দুর্নীতির বিরুদ্ধে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে অভিযোগ পেশ করারও কোনো

---

[৩৫] প্রশাসনিক অভিজ্ঞতাসম্পন্ন শতাধিক জ্যেষ্ঠ অধ্যাপকদের ডিঙ্গিয়ে তিনি ভিসি হন। উক্ত ভিসি'র সাথে একটি সিটি করপোরেশনের মেয়রের সুসম্পর্ক রয়েছে। উক্ত মেয়রের সাথে সরকারের উচ্চ পর্যায়ের নীতিনির্ধারকদের সাথে যোগাযোগ এক্ষেত্রে মূখ্য ভূমিকা রেখেছে বলে ভিসি'র সহকর্মীদের একাংশের অভিমত।

সুযোগ নেই। যেহেতু উপাচার্য ও উপ-উপাচার্যদের একাংশ এ ধরনের অনিয়ম-দুর্নীতির সাথে সম্পৃক্ত থাকেন সেহেতু তাদের নিকট অভিযোগ করে কোনো লাভ হবে না বলে তথ্যদাতাদের অভিমত।

২.৪.৮ তথ্য জানার সুযোগ না থাকা

বেশির ভাগ বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রার্থীদের আবেদনপত্রের সাথে জমাকৃত নথির বিপরীতে প্রাপ্তি স্বীকারের ব্যবস্থা ও নিয়োগ পরীক্ষার জন্য বাছাই না করার কারণ ও নিয়োগ পরীক্ষার নম্বরসহ অন্যান্য বিষয় সম্পর্কে জানার কোনো সুযোগ প্রার্থীদের নেই।

উপসংহার

উপরোক্ত আলোচনা থেকে দেখা যায় বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে নিয়োগের যে বিধিমালা বা আইন রয়েছে তাতে নিয়োগ সংক্রান্ত বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, যেমন - প্রার্থীদের যাচাই-বাছাই পদ্ধতি, নম্বর দেওয়ার নিয়ম ও কাঠামো ইত্যাদি স্পষ্টভাবে উল্লেখ নেই বা কোনো কোনো ক্ষেত্রে কোনো দিক নির্দেশনা নেই। আবার বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী হচ্ছে সিন্ডিকেট এবং সিন্ডিকেটে সভাপতিত্ব করেন উপাচার্য। উপাচার্য নিয়োগের ক্ষেত্রে রাজনৈতিক পরিচয় বিবেচনায় নেওয়া এবং সিন্ডিকেট গঠনেও ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক মতাদর্শের অনুসারীদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা হওয়ার প্রবণতা লক্ষণীয়। এর মধ্য দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক অনুসারী তৈরি বা ভোট বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে নিয়োগ সংক্রান্ত যেকোনো নিয়ম ইচ্ছামাফিক বা প্রয়োজনমতো পরিবর্তন করে তা সিন্ডিকেট কর্তৃক অনুমোদনের মাধ্যমে একই রাজনৈতিক মতাদর্শের অনুসারী, আত্মীয় ও এলাকার প্রার্থীদের নিয়োগ করার সুযোগ সৃষ্টি হয়।

তৃতীয় অধ্যায়
প্রভাষক নিয়োগ প্রক্রিয়ায় অনিয়ম ও দুর্নীতি এবং সংশ্লিষ্ট অংশীজন

উচ্চশিক্ষার সর্বোচ্চ স্তর হিসেবে সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের গুরুত্ব অপরিসীম। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদেরঅন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কাজ হলো শ্রেণীকক্ষে পাঠদান ও গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করা। এক্ষেত্রে মেধাবী শিক্ষকের কোনো বিকল্প নেই। এই অধ্যায়ে গবেষণায় প্রাপ্ত প্রভাষক নিয়োগের বিভিন্ন ধাপে সংঘঠিত অনিয়ম-দুর্নীতির চিত্র, এর বিভিন্ন উপাদান বা প্রভাবক এবং অনিয়ম-দুর্নীতির সাথে সংশ্লিষ্ট অংশীজনের ভূমিকা উপস্থাপন করা হলো।

৩.১ নিয়োগ পূর্ব অনিয়ম-দুর্নীতি

৩.১.১ ফলাফল ইঞ্জিনিয়ারিং[৩৬] এর মাধ্যমে নিয়োগে সুযোগ প্রদান

বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রভাষক নিয়োগের অনিয়মটি অনেক ক্ষেত্রে অ্যাকাডেমিক পড়াশোনার সময় থেকে শুরু হয়। ছাত্রাবস্থায় শিক্ষক কর্তৃক ফলাফল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের অ্যাকাডেমিক ফলাফল প্রভাবিত করা ও পরবর্তীতে প্রভাষক হিসেবে নিয়োগ প্রদান করা। গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত প্রায় সকল বিশ্ববিদ্যালয়েই ফলাফল ইঞ্জিনিয়ারিং বা ইচ্ছাকৃতভাবে নম্বর কমিয়ে-বাড়িয়ে দেওয়ার কম-বেশি উদাহরণ পাওয়া যায়। পূর্বে এই ফলাফল ইঞ্জিনিয়ারিং এর সুযোগ বেশি ছিলো এবং বেশিসংখ্যাক শিক্ষার্থী এর শিকার হতো। কোনো কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে বিজ্ঞান বা বাণিজ্য অনুষদ থেকে সামাজিক বিজ্ঞান ও কলা অনুষদে এই প্রবণতা বেশি। প্রথম বা দ্বিতীয় সেমিস্টারের ফলাফল বের হওয়ার পর থেকেই শিক্ষকরা বুঝতে পারেন কোন শিক্ষার্থীর ভালো ফলাফল করার সম্ভাবনা রয়েছে এবং কোন শিক্ষার্থীর শিক্ষক হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এসময় থেকেই শিক্ষকরা শিক্ষার্থীদের সাথে পক্ষপাতমূলক আচরণ শুরু করেন। পাশাপাশি উক্ত শিক্ষার্থীরা শিক্ষকদের সাথে তদবির করতে শুরু করেন।

বক্স ৩.১: ফলাফল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের উদাহরণ

একজন শিক্ষার্থী স্নাতকে (সম্মান) প্রথম হন। উক্ত শিক্ষার্থী স্নাতকোত্তরে পার্ট - এক ও দুই-এ প্রথম হলেও স্নাতকোত্তর থিসিসে বি প্লাস পান। একজন শিক্ষক তার নিজ এলাকার একজন নারী শিক্ষার্থীকে স্নাতকোত্তরে প্রথম স্থান পেতে সহায়তা করার জন্যইচ্ছাকৃতভাবে প্রথম স্থান অধিকারী শিক্ষার্থীকে কম নম্বর দেন। উল্লেখ্য শেষোক্ত শিক্ষার্থীর সাথে উক্ত শিক্ষকের প্রেমের সম্পর্ক ছিলো। [তথ্যসূত্র ও তথ্য সংগ্রহের তারিখ: মুখ্য তথ্যদাতা সাক্ষাৎকার, আগস্ট ৪, ২০১৬]

একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি বিভাগের দু'জন শিক্ষার্থীর থিসিস সুপারভাইজার বাইরের বিশেষজ্ঞকে দু'রকম নম্বর দিতে বলেন। তিনি একজনকে ৯০ শতাংশ অন্য জনকে ৬০ শতাংশ নম্বর দিতে বলেন। উক্ত শিক্ষক (থিসিজ সুপারভাইজার) এক্সটারনল পরীক্ষকের নিকট বসে থেকে অভিপ্রায় মোতাবেক নম্বর নিয়ে আসেন এবং পরবর্তীতে বেশি নম্বর দেওয়া শিক্ষার্থীকে শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ পাওয়ার সুযোগ করে দেন। একই বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজকল্যাণ বিভাগের এক শিক্ষার্থীকে শূন্য নম্বর দেওয়া হয়। [তথ্যসূত্র ও তথ্য সংগ্রহের তারিখ: মুখ্য তথ্যদাতা সাক্ষাৎকার, ফেব্রুয়ারি ২৮, ২০১৬]

অপর একটি বিভাগের দুইজন সংখ্যালঘু গোষ্ঠীর শিক্ষক নিজেদের মধ্যে যোগসাজসে একজন হিন্দু ধর্মীয় শিক্ষার্থীর নম্বর বাড়িয়ে দিয়ে প্রথম শ্রেণিতে চতুর্থ স্থান পেতে সহায়তা করেন। এতে উক্ত শিক্ষার্থী পরবর্তীতে শিক্ষক হিসেবে নিয়োগের সুযোগ পান। [তথ্যসূত্র ও তথ্য সংগ্রহের তারিখ: মুখ্য তথ্যদাতা সাক্ষাৎকার, আগস্ট ৯, ২০১৬]

বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রভাষক নিয়োগের ক্ষেত্রে ফলাফল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের একটি বড় প্রভাব থাকে। যেহেতু মৌখিক পরীক্ষা শিক্ষক নিয়োগের একমাত্র পদ্ধতি সেহেতু প্রার্থীদের দক্ষতা যাচাই করার সবচেয়ে বড় নির্দেশক হচ্ছে তার অ্যাকাডেমিক ফলাফল। এজন্য সাধারণত বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রভাষক নিয়োগের ক্ষেত্রে সবচেয়ে ভালো ফলাফল করা[৩৭] শিক্ষার্থীদেরকেই নিয়োগে প্রাধান্য

---

[৩৬] ইচ্ছাকৃতভাবে বা উদ্দেশ্যমূলকভাবে অ্যাকাডেমিক (স্নাতক ও স্নাতকোত্তর) পরীক্ষার নম্বর কমিয়ে দেওয়া বা বাড়িয়ে দেওয়ার মাধ্যমে কোনো শিক্ষার্থীর ফলাফল ভাল বা খারাপ করে দেওয়াই হচ্ছে ফলাফল ইঞ্জিনিয়ারিং।

[৩৭] যারা প্রথম শ্রেণিতে প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ বা অন্য কোনো স্থান অধিকার করে থাকে।

দেওয়ার রেওয়াজ রয়েছে। আর এই প্রভাষকগণ যাতে পরবর্তীতে পুরাতন শিক্ষকদের অনুসারী হন সেজন্য নিজের পছন্দের শিক্ষার্থীকে (পরবর্তীতে প্রার্থী) নিয়োগ দিতে চান। এ কারণে ছাত্রাবস্থায় পছন্দের শিক্ষার্থীদের নম্বর বাড়িয়ে দেওয়া, পরীক্ষার পূর্বে প্রশ্ন বলে দেওয়া বা সম্ভাব্য প্রশ্নের ব্যাপারে ধারণা দেওয়ার মতো তথ্য পাওয়া যায়। ভাল নম্বর দেওয়ার জন্য শিক্ষার্থী কর্তৃক শিক্ষকদের বাজার করাসহ অন্যান্য ব্যক্তিগত কাজ করে দেওয়ার মতো দৃষ্টান্ত রয়েছে। অপরদিকে, অপছন্দের শিক্ষার্থীকে নম্বর কমিয়ে দেওয়ার মতো উদাহরণও রয়েছে। কখনও কখনও শিক্ষক তাঁর অপছন্দের শিক্ষকের পছন্দের শিক্ষার্থীকেও কম নম্বর দেওয়ার তথ্য রয়েছে। আবার ক্ষেত্র বিশেষে নারী শিক্ষার্থীদের সাথে বিশেষ সম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যমে নম্বর বাড়িয়ে দেওয়া, পরীক্ষার পূর্বে প্রশ্ন বলে দেওয়া বা সম্ভাব্য প্রশ্নের ব্যাপারে ধারণা দেওয়ার মতো তথ্য পাওয়া যায়।

বক্স ৩.২: বিশেষ সম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যমে নিয়োগ

একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন অধ্যাপক স্ত্রী থাকা সত্ত্বেও একজন ছাত্রীর সাথে বিশেষ সম্পর্ক তৈরি করেন এবং ওই শিক্ষার্থী সন্তানসম্ভবা হয়ে পড়েন। এমতাবস্থায় ওই শিক্ষার্থীকে উক্ত শিক্ষক বিয়ে করতে বাধ্য হন। শারীরিক সম্পর্ক স্থাপনের বিনিময়ে উক্ত শিক্ষক তার শিক্ষার্থীকে প্রথম শ্রেণি পেতে সহায়তা করেন। এরই মধ্যে সরকার পরিবর্তন হলে উক্ত শিক্ষক দল পরিবর্তন করে ভিসি'র সাথে সম্পর্ক উন্নয়ন করেন এবং উক্ত ছাত্রীকে (স্ত্রীকে) শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ পেতে সহায়তা করেন। [তথ্যসূত্র ও তথ্য সংগ্রহের তারিখ: মুখ্য তথ্যদাতা সাক্ষাৎকার, মার্চ ৮, ২০১৬]

৩.১.২ প্রভাষক হিসেবে নিয়োগ দেওয়া বা না দেওয়ার জন্য ফলাফল প্রকাশ প্রলম্বিত কিংবা দ্রুত প্রকাশ করা

প্রভাষক নিয়োগ প্রক্রিয়ার পূর্বের একটি অনিয়ম-দুর্নীতির ধরন হচ্ছে পছন্দের প্রার্থীকে নিয়োগ দেওয়ার জন্য দ্রুত অ্যাকাডেমিক ফলাফল প্রকাশ করা ও অপছন্দের প্রার্থীদের নিয়োগ ঠেকাতে ইচ্ছাকৃতভাবে ফলাফল প্রকাশে দেরি করা। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রাপ্ত তথ্য থেকে দেখা যায় যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক নিয়োগের বিষয়টি অনেক ক্ষেত্রেই সিন্ডিকেটের ওপর নির্ভর করে। ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলের মতাদর্শের প্রার্থীদেরকে নিয়োগ দেওয়ার জন্য কখনও কখনও নিয়োগের সময় পিছিয়ে দেওয়া হয়। যেমন - ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক মতাদর্শের অনুসারী কোনো বিভাগের একজন প্রার্থীর স্নাতক এবং স্নাতকোত্তর পর্যায়ের অ্যাকাডেমিক ফলাফল ভাল হওয়ার সম্ভাবনা থাকায় তার জন্য নিয়োগ পরীক্ষার সময় পিছিয়ে দেওয়া হয়। উপাচার্য বা উপ-উপাচার্য উক্ত প্রার্থীকে নিয়োগের জন্য পছন্দ করেছেন বলে এমনটি ঘটেছে। এমতাবস্থায় তার পরীক্ষার ফলাফল দ্রুত প্রকাশ করে তাকে আবেদনের উপযোগী করে পরবর্তীতে নিয়োগ দেওয়া হয়।

অপরদিকে, তার উল্টো চিত্রও লক্ষ্য করা গেছে। যেমন - কোনো প্রার্থীর স্নাতক পর্যায়ের অ্যাকাডেমিক ফলাফল ভালো এবং স্নাতকোত্তর ফলাফলও ভালো হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে আবার তিনি ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক মতাদর্শের অনুসারী এবং উপাচার্য বা উপ-উপাচার্য'র পছন্দের প্রার্থী ছিলেন না বলে তিনি যাতে আবেদন করতে না পারেন সেজন্য ইচ্ছাকৃতভাবে পরীক্ষার ফলাফল দেরিতে প্রকাশ করা হয়। নিয়োগ সম্পন্ন হয়ে গেলে তার পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ করা হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রভাষক নিয়োগের এই চিত্র সকল বিশ্ববিদ্যালয়েই বিদ্যমান রয়েছে বলে গবেষণায় তথ্য পাওয়া যায়। তবে ঢাকার বাইরের বিশ্ববিদ্যালয়ে এই প্রবণতা কিছুটা বেশি। যেসব বিশ্ববিদ্যালয়ে অ্যাকাডেমিক ফলাফলকেই প্রভাষক নিয়োগের প্রধান নির্দেশক হিসেবে দেখা হয় সেসব বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে এই চিত্র তুলনামূলকভাবে কম।

৩.২ নিয়োগ প্রক্রিয়ার বিভিন্ন ধাপে অনিয়ম ও দুর্নীতি

৩.২.১ ধাপ ১ ও ২: চাহিদা নির্ধারণ/পেশ, যাচাই ও পদ অনুমোদন

প্রাপ্ত তথ্যে দেখা যায় শিক্ষক নিয়োগের চাহিদাপত্র দেওয়ার পূর্বে শিক্ষকদের কাজের চাপ অর্থাৎ একজন শিক্ষকের বিপরীতে ক্লাস সংখ্যা, শিক্ষার্থীর সংখ্যা ইত্যাদি সঠিকভাবে যাচাই করা হয় না। সাধারণত প্রভাষকদের সপ্তাহে চার থেকে পাঁচটি কোর্স পড়ানোর নিয়ম রয়েছে। এরপর জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে ক্রমান্বয়ে ক্লাসের সংখ্যা কমতে থাকে। কিন্তু বেশিরভাগ বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকদের ক্লাসের সংখ্যা যাচাই না করে ভোট বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে বা অনুসারী তৈরি করার জন্য পদ শূন্য থাকলেই শিক্ষক নিয়োগের চাহিদা প্রদান করে থাকে। এভাবে প্রয়োজন না থাকা সত্ত্বেও শিক্ষক নিয়োগ দেওয়ার ফলে নতুন নিয়োগপ্রাপ্ত উক্ত শিক্ষকদের জন্য সঠিক সংখ্যক ক্লাস বরাদ্দ দেওয়া সম্ভব হয় না। কোনো কোনো ক্ষেত্রে একটি কোর্স পড়ানোর দায়িত্ব দু'জন

শিক্ষককে দেওয়ারও উদাহরণ রয়েছে। এমনকি কোনো কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রয়োজনের অতিরিক্ত শিক্ষক নিয়োগ দেওয়ায় নিয়োগপ্রাপ্ত শিক্ষকদের বসার জায়গা দেওয়া যাচ্ছে না।

বক্স ৩.৩: প্রয়োজন না থাকা সত্ত্বেও নিয়োগ

একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি বিভাগে একজন শিক্ষক বিদেশে থাকা অবস্থায় শিক্ষকের চাহিদা না থাকা সত্ত্বেও শিক্ষক নিয়োগ দেওয়া হয়। [তথ্য সংগ্রহের তারিখ: আগস্ট ৪, ২০১৬]

একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে সরকারের শেষের দিকে এসে একটি বিভাগে চাহিদা না থাকা সত্ত্বেও ছয়জন প্রভাষক নিয়োগ দেওয়া হয়। [তথ্য সংগ্রহের তারিখ: আগস্ট ৩, ২০১৬]

একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে বিভাগের চেয়ারম্যান ও উর্ধ্বতন শিক্ষকদের না জানিয়ে পাঁচজন শিক্ষক নিয়োগের জন্য প্রশাসনের পক্ষ থেকে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়। [তথ্য সংগ্রহের তারিখ: জুন ৩০, ২০১৬]

আবার কোনো কোনো ক্ষেত্রে শিক্ষকদের কৃত্রিম সংকট দেখিয়ে শিক্ষক নিয়োগের চাহিদা দেওয়া হয়। যেসব বিভাগের শিক্ষকদের বাইরে পরামর্শক হিসেবে কাজ করার সুযোগ বেশি, যারা বাইরের বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্লাস নেন বা সান্ধ্যকালীন কোর্স পড়ান তাদের মধ্যে এই প্রবণতা লক্ষ করা যায়। এসব বিভাগে নতুন শিক্ষক নিয়োগের জন্য চাপ প্রয়োগ করা হয়। এসব বিভাগে আসলে নতুন শিক্ষক নিয়োগের প্রয়োজনীয়তা আছে কিনা তা যাচাই করা হয় না।

বক্স ৩.৪: প্রয়োজন থাকা সত্ত্বেও নিয়োগের চাহিদা না দেওয়ার উদাহরণ

একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি বিভাগে শিক্ষকের অভাবে পরীক্ষা নিতে পারছে না ও অ্যাকাডেমিক ফলাফল আটকে থাকছে। মূলত প্রভাবশালী শিক্ষকদের একাংশ নিজেদের মতাদর্শের অনুসারীদের এ সময়ে নিয়োগ দিতে পারবে না বলে নিয়োগের চাহিদা দিচ্ছে না। কিন্তু সিন্ডিকেট থেকে সমন্বয় ও উন্নয়ন কমিটির সভা করে এই বিভাগে নিয়োগ দেওয়া হয়। [তথ্যসূত্র ও তথ্য সংগ্রহের তারিখ: মুখ্য তথ্যদাতা সাক্ষাৎকার, ১৮ জুলাই ২০১৬]

'আমাদের অনুষদে আমরা নিয়োগ করতে দিচ্ছি না, কারণ বর্তমান সময়ের সরকার সমর্থিত কোনো ক্যাডারকে আমরা নিয়োগ দিতে দেব না। যেহেতু নিয়োগ দিলেই বর্তমান সরকার সমর্থিত প্রার্থীর নিয়োগ পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে সেহেতু আমরা কোনো চাহিদা পাঠাচ্ছি না।' [তথ্যসূত্র ও তথ্য সংগ্রহের তারিখ: সংশ্লিষ্ট অনুষদের একজন শিক্ষকের মন্তব্য, ১১ আগস্ট ২০১৬]

কখনও কখনও কোনো কোর্স পড়ানোর মতো শিক্ষার্থী বা ওই কোর্স নেওয়ার মতো শ্রেণিকক্ষ না থাকলেও সিলেবাসে কোর্স থাকার কারণ বা যৌক্তিকতা দেখিয়ে শিক্ষক নিয়োগ দেওয়া হয়। আবার কোনো কোনো ক্ষেত্রে সান্ধ্যকালীন কোর্সের কর্মঘন্টা দেখিয়ে শিক্ষক নিয়োগের চাহিদা পাঠানো হলেও শিক্ষক নিয়োগ দেওয়া হয় সকালের কোর্সে ক্লাস নেওয়ার জন্য। তবে এই চিত্র সকল বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল বিভাগে সমানভাবে প্রযোজ্য নয়। কোনো কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগে শিক্ষকের প্রয়োজন থাকলেও চাহিদাপত্র দেওয়া হয় না। এ ধরনের একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি বিভাগে ১২০ জন শিক্ষার্থীকে একই সাথে পাঠদান করা হচ্ছে কিন্তু সেকশন করা হয় নি। ফলে শ্রেণীকক্ষে উপস্থিত সব শিক্ষার্থীদের নিকট সমানভাবে শিক্ষকদের পাঠদান বোধগম্য হয় না। একই বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি অনুষদের নিয়ন্ত্রণে মাত্র একটি বিভাগ রয়েছে, অথচ এখানে নতুন বিভাগ খোলা এখন সময়ের দাবি হলেও নতুন বিভাগ খোলার বিষয়ে বিভাগীয় শিক্ষকদের আগ্রহ দেখা যায় নি।

প্রয়োজন থাকা সত্ত্বেও বিভাগ থেকে চাহিদা পেশ না করলে উপাচার্য ও উপ-উপাচার্য'র পক্ষ থেকে বার বার তাগিদ দেওয়া সত্ত্বেও বিভাগের পক্ষ থেকে কোনো পদক্ষেপ নেওয়া হয় না। এর পেছনে যে বিষয়টি কাজ করে তা হচ্ছে ভিন্ন রাজনৈতিক সমর্থনকারী বা মতাদর্শের অনুসারী প্রার্থীদের শিক্ষক হিসেবে নিয়োগকে ঠেকানো। আবার ভিন্ন রাজনৈতিক মতাদর্শের হওয়া এবং তাদের পক্ষে ভোট না দেওয়ার কারণে একটি ধর্মীয় সংখ্যালঘু প্রার্থীদের নিয়োগ ঠেকাতে নিয়োগের চাহিদা পেশ করা হয় নি বলে লক্ষ্য করা গেছে। এই গবেষণায় দেখা গেছে একটি প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি বিভাগে ১৯৯৫ সাল থেকে ২০০১ সাল পর্যন্ত সময়ে প্রথম শ্রেণিতে প্রথম স্থান অধিকারীদেরকে না নেওয়ার জন্য বিভাগ থেকে কোনো চাহিদাপত্রই পাঠানো হয় নি। এসব ক্ষেত্রে দেখা গেছে কোনো বিভাগে একজন শিক্ষার্থী প্রথম শ্রেণিতে প্রথম স্থান অধিকার করেছেন, কিন্তু তিনি

ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলের অনুসারী নন। সেক্ষেত্রে ওই বছরে বিভাগে শিক্ষক প্রয়োজন হলেও নিয়োগের চাহিদা পাঠানো হয় নি, কারণ নিয়োগ পরীক্ষা হলে প্রথম শ্রেণিতে প্রথম হওয়ার কারণে উক্ত প্রার্থীকে বাদ দেওয়া অনেক কঠিন হয়ে পড়ে। প্রায় প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়ে সকল সরকারের সময়ে এই চিত্র লক্ষণীয়।

নিয়োগের চাহিদা অনুমোদনের ক্ষেত্রে অ্যাকাডেমিক কাউন্সিলের পক্ষ থেকে যাচাই-বাছাই না করে অুনমোদন দেওয়ার অভিযোগ রয়েছে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে মূলত ভোট বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে অনুসারী তৈরির জন্য যে কোনো চাহিদা অনুমোদন দিয়ে নিয়োগের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করার উদাহরণ রয়েছে। ইউজিসি নতুন পদ অনুমোদনের ক্ষেত্রে তেমন কোনো সমস্যা তৈরি না করলেও কোনো কোনো ক্ষেত্রে তাদের অনুমোদনে দীর্ঘসূত্রতার তথ্য পাওয়া গেছে।

৩.২.২ ধাপ ৩: নিয়োগের যোগ্যতা নির্ধারণ ও বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ

প্রাপ্ত তথ্যে দেখা যায়, কোনো সুনির্দিষ্ট প্রার্থী যেমন একই রাজনৈতিক মতাদর্শের অনুসারী, আত্মীয়, এলাকার প্রার্থী বা বিভাগের কোনো শিক্ষকের পছন্দের প্রার্থীকে নিয়োগ দেওয়ার জন্য দীর্ঘদিন ধরে বিদ্যমান নিয়োগের শর্ত পরিবর্তন করা হয়। আবার অন্য নিয়োগের সময়পূর্বের শর্তে ফেরার বিষয়টি লক্ষ্য করা গেছে, যেমন - একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে দেখা গেছে ২০১৬ সালের ১৪ মার্চের সিন্ডিকেট সভার পূর্ব পর্যন্ত নিয়োগের ন্যূনতম শর্ত ছিল স্নাতক (সম্মান/প্রকৌশল) ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ে সিজিপিএ ৪ এর মধ্যে ৩.৫০ থাকতে হবে।

বক্স ৩.৫: সিজিপিএ কমানোর বিষয়ে সিন্ডিকেট সভার সিদ্ধান্ত

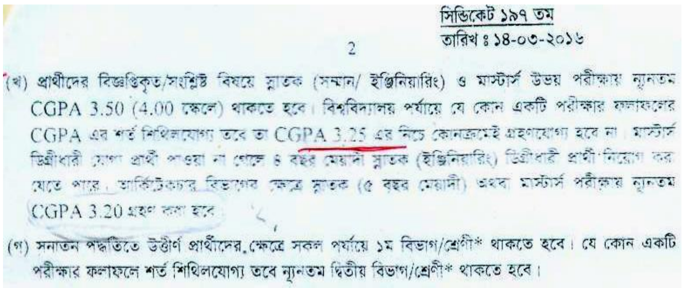

সিন্ডিকেট ১৯৭ তম
তারিখ ঃ ১৪-০৩-২০১৬

2

(খ) প্রার্থীদের বিজ্ঞপ্তিকৃত/সংশ্লিষ্ট বিষয়ে স্নাতক (সম্মান/ ইঞ্জিনিয়ারিং) ও মাস্টার্স উভয় পরীক্ষায় ন্যূনতম CGPA 3.50 (4.00 স্কেলে) থাকতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে যে কোন একটি পরীক্ষার ফলাফলের CGPA এর শর্ত শিথিলযোগ্য তবে তা CGPA 3.25 এর নিচে কোনক্রমেই গ্রহণযোগ্য হবে না। মাস্টার্স ডিগ্রীধারী যোগ্য প্রার্থী পাওয়া না গেলে ৪ বছর মেয়াদী স্নাতক (ইঞ্জিনিয়ারিং) ডিগ্রীধারী প্রার্থী নিয়োগ করা যেতে পারে। আর্কিটেকচার বিভাগের ক্ষেত্রে স্নাতক (৫ বছর মেয়াদী) অথবা মাস্টার্স পরীক্ষায় ন্যূনতম CGPA 3.20 গ্রহণ করা হবে।

(গ) সনাতন পদ্ধতিতে উত্তীর্ণ প্রার্থীদের ক্ষেত্রে সকল পর্যায়ে ১ম বিভাগ/শ্রেণী* থাকতে হবে। যে কোন একটি পরীক্ষার ফলাফলে শর্ত শিথিলযোগ্য তবে ন্যূনতম দ্বিতীয় বিভাগ/শ্রেণী* থাকতে হবে।

কিন্তু নির্ধারিত প্রার্থীকে নিয়োগ দিতে বিশ্ববিদ্যালয়টির প্রকৌশল অনুষদের একটি বিভাগ পছন্দের প্রার্থীকে নিয়োগ দেওয়ার জন্য নিয়োগের ন্যূনতম শর্ত পরিবর্তন করে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ের যেকোনো একটিতে সিজিপিএ ৩.২৫ করা হয়।[৩৮] উল্লেখ্য যে, উক্ত বিভাগের পছন্দের শিক্ষার্থী স্নাতক পর্যায়ের ফলাফলে সিজিপিএ ৩.৫০ অর্জন করতে পারে নি। সারাদেশে যখন শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ভাল অ্যাকাডেমিক ফলাফলকে গুরুত্ব দেওয়ার জন্য ন্যূনতম যোগ্যতা হিসেবে সিজিপিএ বৃদ্ধি করা হচ্ছে সেখানে এই বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রকৌশল ও বিজ্ঞান অনুষদে ন্যূনতম সিজিপিএ কমানো হয়েছে। অথচ এই অনুষদে অসংখ্য ৩.৫০ সিজিপিএপ্রাপ্ত প্রার্থী রয়েছে বলে তথ্য পাওয়া যায়।

বক্স ৩.৬: পছন্দের প্রার্থীকে নিয়োগের জন্য সিজিপিএ কমানোর উদাহরণ

একজন নির্ধারিত প্রার্থীকে নিয়োগ দেওয়ার জন্য আবেদনের ন্যূনতম শর্ত সিজিপিএ 'এ' মাইনাস (এ-) কমিয়ে 'বি' প্লাস (বি+) করা হয়, কারণ তার অ্যাকাডেমিক ফলাফল 'এ' মাইনাস ছিল না। [তথ্য সংগ্রহের তারিখ: আগস্ট ৪, ২০১৬]

নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিতে স্নাতক ও স্নাতকোত্তরে সিজিপিএ ৩.৫ ফলাফল থাকতে হবে বলে উল্লেখ ছিল, কিন্তু পছন্দের প্রার্থীর অ্যাকাডেমিক ফলাফল স্নাতক বা স্নাতকোত্তরের একটিতে সিজিপিএ ৩.৪ পেয়েছে। তখন সিন্ডিকেটে সভা করে নিয়োগের নীতিমালা পরিবর্তন করে পছন্দের প্রার্থীকে নিয়োগ দেওয়া হয়। [তথ্য সংগ্রহের তারিখ: আগস্ট ৪, ২০১৬]

---

[৩৮] একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৯৭ তম সিণ্ডিকেট সভার সিদ্ধান্ত, তারিখ ১৪ মার্চ ২০১৬।

আবার বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর বিজ্ঞপ্তিতে দেখা যায় নিয়োগের শর্তে ‘বিশেষ যোগ্যতাসম্পন্ন প্রার্থীর জন্য যেকোনো শর্ত শিথিলযোগ্য’ বলে উল্লেখ করা হয়। অথচ এই বিশেষ যোগ্যতাসম্পন্ন বলতে কী বোঝানো হবে তা স্পষ্ট করে বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ থাকে না। ফলে এই ‘বিশেষ যোগ্যতা’কে অপব্যবহার করে পছন্দের প্রার্থীকে নিয়োগ দেওয়া হয়।

বক্স: ৩.৭ বিশেষ যোগ্যতার সুযোগে তুলনামূলক কম যোগ্য প্রার্থীকে নিয়োগ

নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিতে এসএসসি, এইসএসসি, স্নাতক ও স্নাতকোত্তরে মোট চারটি প্রথম শ্রেণি আবেদনের যোগ্যতা হিসেবে উল্লেখ করা ছিলো। একই বিজ্ঞপ্তিতে বিশেষ যোগ্যতাসম্পন্ন প্রার্থীর ক্ষেত্রে শিক্ষাগত যোগ্যতার শর্ত শিথিলযোগ্য বলেও উল্লেখ করা হয়। আবেদনকারীদের মধ্যে চারটি প্রথম শ্রেণীপ্রাপ্ত একাধিক প্রার্থী থাকলেও জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে কলেজ থেকে পাশ করা তিনটি প্রথম শ্রেণিপ্রাপ্ত একজন চাকরি প্রার্থীকে প্রভাষক হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়। এক্ষেত্রে নিয়োগ বোর্ড শেষোক্ত শর্তটি কাজে লাগায়। [তথ্য সংগ্রহের তারিখ: জুন ১, ২০১৬)।

একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্যের সন্তানের নিয়োগ শেষ হলে পুনরায় শিক্ষক নিয়োগের শর্ত কঠোর করে নতুন নিয়োগ নীতিমালা করা হয়। [তথ্য সংগ্রহের তারিখ: জুন ১৬, ২০১৬]

গবেষণার ফলাফলে দেখা যায়, বিষয়ভিত্তিক চাহিদা অনুযায়ী শিক্ষক নিয়োগ দেয়া হয় না। সাধারণত, বিভাগ থেকে চাহিদা থাকে সুনিদিষ্ট দক্ষতাসম্পন্ন কোনো শিক্ষক নিয়োগের। কিন্তু নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিতে সুনির্দিষ্ট দক্ষতাটি উল্লেখ করা হয় না, বরং বিজ্ঞপ্তিতে শুধু বিভাগের নাম উল্লেখ থাকে। যেহেতু নিয়োগের শর্তে সুনির্দিষ্ট করা হয় না সেই সুযোগে উপাচার্য ডিন, বিভাগীয় প্রধান বা চেয়ারম্যান সেই বিষয়ে অন্য কোনো দক্ষতাসম্পন্ন প্রার্থীকে নিয়োগ দিয়ে থাকেন। এভাবে প্রায় প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়েই নিয়োগের শর্ত সুনির্দিষ্ট না থাকার সুযোগে পছন্দের প্রার্থীকে নিয়োগের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় দক্ষতাসম্পন্ন শিক্ষক নিয়োগকে বাধাগ্রস্ত করে তোলা হয়। আবার কোনো সুনির্দিষ্ট কোনো প্রার্থীকে কিংবা প্রার্থীদেরকে নিয়োগ দেওয়ার লক্ষ্যে নিয়োগের শর্তের মধ্যে নির্দিষ্ট কিছু শর্ত উল্লেখ করে দেওয়া হয়, যেমন - ‘পিএইচডি বা চাকরির অভিজ্ঞতা থাকলে শর্ত শিথিলযোগ্য’। স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ে প্রথম শ্রেণী বা সমমান ভাল ফলাফল না করেও এই শর্তের আলোকে অনেকে আবেদন করার সুযোগ পায়। অথচ যেসব প্রার্থীর স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ের ফলাফল অনেক ভালো বা প্রথম পর্যায়ের তারা এসব নিয়োগ থেকে বঞ্চিত হন। যেমন একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি বিভাগে নিয়োগের শর্ত ছিলো বিবিএ এবং এমবিএ ডিগ্রি থাকতে হবে। কিন্তু যাকে নিয়োগ দেওয়া হয় তার বিকম ও এমকম ছিলো এবং পাশাপাশি পিএইচডি থাকায় তার অন্যান্য শর্ত শিথিল করা হয়। প্রায় প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়েই নিয়োগের শর্ত ভঙ্গ করে নিয়োগ দেওয়া হয়।

কোনো কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে দেখা যায় যে বিভাগীয় চাহিদা না দেওয়া সত্ত্বেও সিন্ডিকেটের পক্ষ থেকে বিভাগকে না জানিয়ে শিক্ষক নিয়োগের জন্য বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়। প্রায় প্রতিটি সরকারের সময়েই ক্ষমতাসীন দলের ভোট বৃদ্ধির করার জন্য একই মতাদর্শে বিশ্বাসী প্রার্থী বা ক্ষমতাসীনদের অনুগত প্রার্থীদের নিয়োগ দেওয়ার জন্য এ ধরনের নিয়োগ দেওয়ার প্রবণতা দেখা যায়। নিয়োগ দিতে না চাইলে কর্তৃপক্ষ থেকে বারবার চাপ দেওয়া হয় নিয়োগ দেওয়ার জন্য। যদি বিভাগের পক্ষ থেকে কর্তৃপক্ষের ইচ্ছা অনুযায়ী নিয়োগের জন্য চাহিদা না পেশ করে তাহলে সিন্ডিকেট নিজেই ওইসব বিভাগের জন্য নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে। এমনকি বিভাগীয় চেয়ারম্যানকে তা জানানোও হয় না। কোনো কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে দেখা যায় সঠিকভাবে প্রয়োজনীয়তা বা চাহিদা যাচাই না করে শুধু ভোট বৃদ্ধি ও অনুসারী সৃষ্টি করার জন্য নতুন বিভাগ বা ইনস্টিটিউট খোলারমাধ্যমে নিয়োগ দেওয়া হচ্ছে।

বক্স: ৩.৮ পছন্দের প্রার্থীকে নিয়োগের জন্য বিজ্ঞপ্তিতে বিশেষ বিষয়ের নাম উল্লেখ

বিজ্ঞপ্তিতে দুইটি বিশেষ বিষয় থেকে পাশকৃত প্রার্থীদেরও উক্ত বিষয়ে নিয়োগ করা যাবে বলে উল্লেখ করা হয়, অথচ যে বিষয়ে নিয়োগ দেওয়া হবে সে বিষয়ে পাশকৃত প্রার্থীর ঘাটতি ছিলো না। একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে পূর্ব নির্ধারিত একজন প্রার্থীকে নিয়োগ দেওয়ার উদ্দেশ্যেই তার বিষয়টি থেকে পাশকৃত প্রার্থীদের নিয়োগ দেওয়ার বিষয়টি বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়। [তথ্য সংগ্রহের তারিখ: মে ৩১, ২০১৬]

কোনো কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে একই রাজনৈতিক মতাদর্শের অনুসারীদের নিয়োগের উদ্দেশ্যে কিংবা ভোট বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে একটি বিভাগকে ভেঙ্গে দু'টি বিভাগ করা হয়েছে। অথচ দেশের প্রেক্ষিতে এই বিভাগগুলোর আদৌ প্রয়োজনীয়তা কতটুকু তা যাচাই করা হয় নি। কোনো কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে এমনও দেখা গেছে যে, বিশ্বদ্যিালয়ের উপাচার্য এতই শক্তিশালী থাকেন যে তিনি সিন্ডিকেটের অনুমোদনকে তোয়াক্কা না করে নিজে সিদ্ধান্ত নিয়ে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে থাকেন এবং পরবর্তীতে সিন্ডিকেটের অনুমোদন আদায় করে নেন। উল্লেখ্য, নিয়োগ বিজ্ঞপ্তির শর্ত সিন্ডিকেট কর্তৃক অনুমোদনের নিয়ম রয়েছে। আবার বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রাপ্ত তথ্য থেকে দেখা গেছে যে, প্রভাষক নিয়োগের ক্ষেত্রে নিয়ম অনুযায়ী বহুল প্রচারিত দৈনিক পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের কথা থাকলেও একই মতাদর্শের অনুসারী বা পছন্দের প্রার্থীদেরকে নিয়োগ দেওয়ার জন্য এবং দূরে অবস্থানকারী প্রার্থীদেকে সুযোগ থেকে বঞ্চিত করার জন্য কম প্রচারিত বা স্থানীয় পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়। কখনও কখনও পছন্দের প্রার্থীকে নিয়োগ দেওয়ার জন্য অন্য প্রার্থীরা যাতে আবেদন করতে না পারে সেজন্য বিজ্ঞপ্তিতে আবেদনের জন্য যথেষ্ঠ সময় দেওয়া হয় না।

৩.২.৩ ধাপ ৪: প্রার্থীতা মূল্যায়ন ও নিয়োগ পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য বাছাই

প্রাপ্ত তথ্যে দেখা যায়, আবেদনপত্র বাছাইয়ের ক্ষেত্রে রেজিস্ট্রার কার্যালয় কর্তৃক যে তালিকা প্রস্তুত করা হয় তাতে অনেক সময় ইচ্ছাকৃতভাবে ভিন্ন রাজনৈতিক মতাদর্শের অনুসারী প্রার্থী বা অপছন্দের প্রার্থীদেরকে কম যোগ্যতাসম্পন্ন দেখানো হয়। সেক্ষেত্রে মিথ্যা তথ্য বা কম তথ্য উল্লেখ করা হয়, যেমন - প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকারীর ক্ষেত্রে শুধু "প্রথম স্থান অধিকারী" বলে উল্লেখ করা; থিসিস, প্রকাশনা বা চাকরির অভিজ্ঞতা থাকলেও প্রার্থীদের সংক্ষিপ্ত বিবরণীতে যোগ্যতা হিসেবে তা উল্লেখ না করা।

আবার কখনও কখনও আবেদনপত্রের সাথে জমাকৃত সনদ, প্রকাশনার কপি, ব্যাংক ড্রাফটের কপিসহ বিভিন্ন নথিপত্র ছিঁড়ে ফেলে বা সরিয়ে ফেলে প্রার্থীদের পক্ষ হতে তা জমা দেওয়া হয় নি বলে উল্লেখ করা হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসন ও ক্ষমতাসীন দলের প্রভাবশালী শিক্ষক ও ছাত্র সংগঠনের নেতাদের একাংশের অভিপ্রায় মোতাবেক বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক ভবন ও সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় অফিসের কর্মচারীদের একাংশ দ্বারা এ ধরনের কাজসম্পন্ন করার অভিযোগ রয়েছে।

এই গবেষণায় নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিতে বর্ণিত আবেদনের সকল শর্ত পূরণ করেও মৌখিক পরীক্ষার জন্য আমন্ত্রণ না পাওয়া এবং শর্ত পূরণ না করেও মৌখিক পরীক্ষার জন্য নিবাচিত হওয়ার উদাহরণ রয়েছে। অ্যাকাডেমিক ফলাফলের শর্ত পূরণ না করলেও মৌখিক পরীক্ষার জন্য তালিকাভুক্ত করা এবং ভিন্ন মতাদর্শের অনুসারী প্রার্থীদের অ্যাকাডেমিক ফলাফলের শর্ত পূরণ করলেও মৌখিক পরীক্ষার জন্য তালিকাভুক্ত না হওয়ার ঘটনা প্রত্যক্ষ করা গেছে। আবার একই মতাদর্শের অনুসারী বা পছন্দের কোনো প্রার্থীদের পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশের পূর্বে নিয়োগের আবেদন করতে দেওয়ার সুযোগ ও মৌখিক পরীক্ষার জন্য নির্বাচিত করা, বিজ্ঞপ্তিতে স্নাতকোত্তর উত্তীর্ণ চাইলেও স্নাতকোত্তর উত্তীর্ণ নয় এমন প্রার্থীদের মৌখিক

বক্স: ৩.৯ নিয়োগের শর্ত ভঙ্গের কয়েকটি উদাহরণ

একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি বিভাগে একটি নিয়োগের ক্ষেত্রে একজন প্রার্থী স্নাতকোত্তর ফলাফল প্রকাশের পূর্বেই আবেদন করে। পরবর্তীতে তাকে নিয়োগ দেওয়া হয়। [তথ্য সংগ্রহের তারিখ: জুন ৩০, ২০১৬]

একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি বিভাগে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ চাকুরিপ্রার্থী থাকা সত্ত্বেও সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য'র অভিপ্রায় মোতাবেক এমন একজনকে প্রভাষক হিসেবে নিয়োগের জন্য নিয়োগ বোর্ড বাছাই করে যার স্নাতক পরীক্ষার ফলাফল নিয়োগ পরীক্ষার ছয়দিন পর প্রকাশিত হয়। নিয়োগপ্রাপ্ত উক্ত ব্যক্তি 'উপাচার্যের প্রিয়পাত্র' হিসেবে ক্যাম্পাসে পরিচিত ছিলেন। [তথ্যসূত্র: ইউজিসি'র একটি তদন্ত প্রতিবেদন]

একজন প্রার্থী বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ত অবস্থায় নকলের দায়ে বহিস্কৃত হন এবং স্নাতক পর্যায়ে তার প্রথম শ্রেণি ছিলো না। এই প্রার্থী তার আবেদনপত্রে জুনিয়র কর্মকর্তার অভিজ্ঞতাকে শিক্ষক হিসেবে কাজ করার ভূয়া অভিজ্ঞতা দেখিয়ে আবেদন করেন। উক্ত নিয়োগে নিয়োগ বোর্ডের সুপারিশকৃত প্রার্থীর নাম ফ্লুইড দিয়ে মুছে উপাচার্য নিজে এই প্রার্থীর নাম লিখে তাকে নিয়োগ দেন। [তথ্য সংগ্রহের তারিখ: আগস্ট ৪, ২০১৬]

একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্যের সন্তানকে ভূয়া এমফিল দিয়ে শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়। [তথ্য সংগ্রহের তারিখ: মে ২২, ২০১৬]

একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি বিভাগে প্রভাষক পদে ত্রিশ বছরের বেশি বয়স্ক একজন প্রার্থীকে 'বিশেষ যোগ্যতা' দেখিয়ে নিয়োগ দেওয়া হয় যা ইউজিসি প্রদত্ত নিয়মের লঙ্ঘন। [তথ্য সংগ্রহের তারিখ: জুন ১, ২০১৬]

পরীক্ষার অংশগ্রহণের জন্য আমন্ত্রণ জানানো ও পরবর্তীতে নিয়োগ দেওয়া এবং কখনও কখনও স্বীকৃত নয় এমন প্রকাশনা ও সংশ্লিষ্ট নয় এমন অভিজ্ঞতা দেখিয়ে মৌখিক পরীক্ষার জন্য আমন্ত্রণ জানানোর মতো তথ্য পাওয়া গেছে।

৩.২.৪ ধাপ ৫: নিয়োগ পরীক্ষা

৩.২.৪.১ নিয়োগ কমিটি গঠন

বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়োগ কমিটিতে বিশেষজ্ঞ হিসেবে কোন কোন শিক্ষক মনোনীত হবেন তা সিন্ডিকেট থেকে নির্ধারণ করা হয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে উপাচার্য বা উপ-উপাচার্যের পছন্দের বা একই রাজনৈতিক মতাদর্শের অনুসারী বা তাঁদের নিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদেরকেই বিশেষজ্ঞ হিসেবে মনোনয়ন দেওয়া হয়। সাধারণত তুলনামূলকভাবে কম প্রভাবশালী বিশেষজ্ঞদেরই উপাচার্যগণ মনোনয়ন দিতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন। এ ধরনের বিশেষজ্ঞকে মনোনয়নের প্রধান কারণ হচ্ছে নিয়োগ বোর্ডে উপাচার্য বা উপ-উপাচার্য'র অভিপ্রায় মোতাবেক নির্দিষ্ট প্রার্থী বা প্রার্থীদের নিয়োগ নিশ্চিত করা। বিশেষজ্ঞ নিয়োগের এই চিত্র অধিকাংশ বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রায় একই রকম। কখনও কখনও দেখা যায়, উপাচার্য তাঁর পছন্দের প্রার্থীকে নিয়োগের জন্য ভিন্ন মতাদর্শের হলেও তার বন্ধুস্থানীয় কোনো বিশেষজ্ঞকে মনোনয়ন দেন। কখনও কখনও একই মতাদর্শের হলেও কোনো কারণে ব্যক্তিগত অপছন্দের বিশেষজ্ঞকে বাদ দিয়ে পছন্দের শিক্ষককে বিশেষজ্ঞ হিসেবে মনোনয়ন দেন।

এমনও দেখা যায় যে, কখনও কখনও কোনো প্রভাবশালী বিশেষজ্ঞকে উপাচার্য তার সিদ্ধান্ত মেনে নিতে বাধ্য করতে না পারলে বা এমন ঝুঁকি থাকলে সেসব ক্ষেত্রে নিয়োগ কমিটির মেয়াদ পূর্ণ না হলেও পুনর্গঠন করা হয়।

বক্স: ৩.১০ নির্দিষ্ট প্রার্থীদের নিয়োগ নিশ্চিত করতে নিয়োগ বোর্ড পুনর্গঠন ও বাতিলের উদাহরণ

একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি নিয়োগে উপাচার্যের একজন পছন্দের প্রার্থী ছিলেন যার অ্যাকাডেমিক ফলাফল ও মৌখিক পরীক্ষার ফলাফল ভালো ছিলো না। ওই নিয়োগ বোর্ডে একজন বিশেষজ্ঞ ছিলেন যিনি নিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রার্থীকে নিয়োগ দিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু উপাচার্য ও বিশেষজ্ঞের প্রার্থী নির্বাচনে দ্বিমত থাকায় নিয়োগ পরীক্ষার আগেই উক্ত বোর্ড বাতিল ও বিশেষজ্ঞ পরিবর্তন করে নতুন বোর্ড গঠন করা হয়। এরপর পুনর্গঠিত বোর্ডের মাধ্যম উপাচার্যের পছন্দের প্রার্থীকে নিয়োগ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বাছাই ও অস্থায়ী ভিত্তিতে নিয়োগ দেওয়া হয়। [তথ্যসূত্র ও তথ্য সংগ্রহের তারিখ: মুখ্য তথ্যদাতা সাক্ষাৎকার, আগস্ট ১১, ২০১৬]

অপর একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি নিয়োগ বোর্ডে বিশেষজ্ঞ হিসেবে একজন প্রভাবশালী শিক্ষকের উপস্থিত থাকার কথা ছিলো। ইতোমধ্যে সকল প্রার্থীকে মোবাইল ফোনের মাধ্যমে মৌখিক পরীক্ষার তারিখও জানিয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু চাকুরিপ্রার্থীরা পরীক্ষা দিতে এসে জানতে পারেন যে ওই দিন পরীক্ষা হবে না। কী কারণে পরীক্ষা হবে না তার কোনো ব্যাখ্যা কর্তৃপক্ষ মৌখিক পরীক্ষা দিতে আসা চাকুরিপ্রার্থীদের জানান নি। পরবর্তীতে জানা যায়, এই পরীক্ষায় উপাচার্যের পূর্বনির্ধারিত প্রার্থী ছিল এবং তার অ্যাকাডেমিক ফলাফল ভালো ছিল না, স্নাতক ও স্নাতকোত্তর দু'টোতেই দ্বিতীয় শ্রেণি ছিলো। যেহেতু উক্ত বিশেষজ্ঞ আনলে এই দ্বিতীয় শ্রেণিপ্রাপ্ত প্রার্থীকে নিয়োগ দেওয়া সম্ভব হবে না সেজন্য তাকে বাদ দিয়ে অন্য বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিশেষজ্ঞ এনে নিয়োগ কমিটি পুনর্গঠন করা হয়। উক্ত নিয়োগে প্রথম শ্রেণিতে প্রথম স্থান অধিকারকারী প্রার্থীসহ একাধিক প্রথম শ্রেণিপ্রাপ্ত প্রার্থী ছিলেন। [তথ্যসূত্র ও সংগ্রহের তারিখ: মুখ্য তথ্যদাতা সাক্ষাৎকার, মার্চ ৮, ২০১৬]

বক্স: ৩.১১ তুলনামূলক কম যোগ্যতাসম্পন্ন প্রার্থীকে নিয়োগ প্রদান

'তোমার তো খুব পরিষ্কার ধারণা আছে। তুমি তো অনেক জানো।' একই বিশেষজ্ঞ অন্য প্রার্থীদের প্রশ্ন করেন, 'তুমি কীভাবে মনে করো তোমার শিক্ষক হওয়ার যোগ্যতা আছে? দুনিয়ার সবাইকে শিক্ষক হতে হবে নাকি? তোমাকে শিক্ষক হইতে বলছে কে?'

উল্লেখ্য এই বোর্ডে ৮০ জনের মধ্যে ৫০ জনেরই অ্যাকাডেমিক ফলাফল ছিলোচারটিতে প্রথম শ্রেণি এবং ২০ জনের পিএইচডি। অথচ যাকে নেওয়া হয়েছে তার স্নাতকোত্তর পর্যায়ে দ্বিতীয় শ্রেণি ছিল। [তথ্যসূত্র ও সংগ্রহের তারিখ: মুখ্য তথ্যদাতা সাক্ষাৎকার, মার্চ ৮, ২০১৬]

কখনও কখনও প্রার্থীর সাথে বিশেষজ্ঞের আত্মীয়তা থাকলেও স্বার্থের দ্বন্দ্ব বিষয়টি বিবেচনা করা হয় না এবং নিয়োগ বোর্ডে বিশেষজ্ঞ হিসেবে নিয়ে আসা হয়। উল্লেখ্য কোনো কোনো ক্ষেত্রে রাজনৈতিক মতাদর্শের চেয়ে ব্যক্তিগত সম্পর্ককে প্রাধান্য দেওয়া হয় যদি নিশ্চিত হওয়া যায় যে সম্পর্কের কারণে কমিটির সভাপতির সুবিধা হবে। উপাচার্য পরিবর্তনের সাথে সাথে বিশেষজ্ঞ

মনোনয়নের ক্ষেত্রেও পরিবর্তন আনা হয়। যেহেতু বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেটের অনুমোদনের মাধ্যমে বিশেষজ্ঞদের মনোনয়নের বিষয়টি চূড়ান্ত হয় আর সিন্ডিকেটে উপাচার্যের পছন্দের ব্যক্তিরাই সদস্য হিসেবে থাকেন সেহেতু উপাচার্যের পছন্দের শিক্ষকদের নিয়োগ বোর্ডে বিশেষজ্ঞ হিসেবে চূড়ান্ত করা খুব সহজ হয়।

৩.২.৪.২ লিখিত পরীক্ষা গ্রহণ

গবেষণায় 'লিখিত পরীক্ষার'[৩৯] ক্ষেত্রেও অনিয়ম সংঘটিত হওয়ার তথ্য পাওয়া যায়, যেমন - নির্বাচনী কমিটির সদস্যদের সকলের অনুমোদন ছাড়া প্রশ্ন তৈরি, পূর্ব থেকেই পছন্দের প্রার্থীকে প্রশ্ন জানিয়ে দেওয়া, পরীক্ষার খাতা নির্বাচনী বোর্ডের সকল সদস্যদের মাধ্যমে যাচাই না করা কিংবা তাদেরকে অবহিত না করা। এই সুযোগে পছন্দের বা নির্ধারিত চাকুরিপ্রার্থীকে নিয়োগ দেওয়ার জন্য লিখিত পরীক্ষার নম্বর বাড়িয়ে দেওয়ার অভিযোগ রয়েছে। একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে বাহির থেকে প্রশ্ন প্রণয়ন করিয়ে তা নির্ধারিত বা পছন্দের প্রার্থীদেরকে লিখিত পরীক্ষার আগে সরবরাহ করার অভিযোগ রয়েছে।

৩.২.৪.৩ মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণ

সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে নিয়োগ পরীক্ষায় বিশেষ করে মৌখিক পরীক্ষায় সকল প্রার্থীকে সমান সুযোগ দেওয়ার হয় না। বোর্ডের সদস্যগণ নিজেদের মতো করে প্রশ্ন করেন এবং কোন প্রার্থীকে নেওয়া হবে বা নেওয়া হবে না এ বিষয়ে মতামত প্রদান করেন। একেক প্রার্থীকে একেক ধরনের প্রশ্ন করা এবং তাদের সম্পর্কে পক্ষপাতমূলক সুপারিশ করার অভিযোগ রয়েছে। গবেষণায় অপছন্দের প্রার্থী বা ভিন্ন মতাদর্শের বা পূর্বনির্ধারিত প্রার্থী না হলে তাকে বিষয় সংশ্লিষ্ট প্রশ্ন না করে অপ্রাসঙ্গিক প্রশ্ন করে বিব্রত করার তথ্য পাওয়া যায় (বক্স ৩.১২ দেখুন)।

বক্স: ৩.১২ কয়েকটি অপ্রাসঙ্গিক প্রশ্ন ও মন্তব্য

১. "এতোগুলো বই কেন প্রকাশ করেছো?'বই প্রকাশ করার দরকার কি?"
২. "তোমার তো মিডিয়াতে এক্সপোজার বেশি, ওইখানেই কাজ করো।"
৩. "বি প্লাস কীভাবে পাওয়া যায় বলোতো?"
৬. "তুমি কেবল পাশ করেছো। পাশ করার সাথে সাথে আর্টিকেল ছাপালে? এতো জ্ঞানী হয়ে গেলে।" একই বোর্ডের একই ব্যক্তির পছন্দের প্রার্থী সম্পর্কে মন্তব্য, "দেখেছেন এত অল্প বয়সেই দুইটি পাবলিকেশন করে ফেলেছে।"

[তথ্যসূত্র ও সংগ্রহের তারিখ: মুখ্য তথ্যদাতা সাক্ষাৎকার, মার্চ ৮ - আগস্ট ৪, ২০১৬]

যেসব প্রার্থীদের সম্পর্কে নিয়োগ কমিটির পূর্ব থেকেই নেতিবাচক ধারণা থাকে বা অপছন্দের হয়ে থাকে তাদেরকে মৌখিক পরীক্ষায় অল্প সময় রাখা হয়, কম প্রশ্ন করা হয় কিংবা অবান্তর প্রশ্ন করা হয় আবার কোনো কোনো ক্ষেত্রে কোনো প্রশ্ন করা হয় না। আবার যেহেতু মৌখিক পরীক্ষার কোনো নির্দেশনা বা কাঠামো নেই সেহেতু পছন্দের প্রার্থী বা একই রাজনৈতিক মতাদর্শের অনুসারী প্রার্থী বা পূর্ব নির্ধারিত প্রার্থী হলে তাকে সংশ্লিষ্ট না হলেও অকারণে প্রশংসা করা হয়। একই বোর্ডে একই ব্যক্তি অপছন্দের প্রার্থীকে তার প্রকাশনার জন্য কটূক্তি করলেও পছন্দের প্রার্থীকে প্রকাশনার জন্য প্রশংসা করেন। কখনও কখনও অপছন্দের প্রার্থীদের নিয়োগ বোর্ডের সদস্যরা প্রার্থীদের সাথে খারাপ ব্যবহার করেন ও কাগজপত্র ছুঁড়ে ফেলে দেন। গবেষণায় হেনস্তার শিকার হয়ে মৌখিক পরীক্ষার বোর্ড থেকে চাকরি প্রার্থীদের কেঁদে বের হওয়ার অভিযোগ পাওয়া গেছে। বাংলাদেশের একজন প্রভাবশালী অধ্যাপক নিয়োগ বোর্ডে একজন প্রার্থীর পিএইচডি থিসিস পেপার ছুড়ে ফেলে দেওয়ার অভিযোগ রয়েছে।

বক্স: ৩.১৩ বিষয়-বহির্ভূত প্রশ্নের উদাহরণ

প্রকৌশল সংক্রান্ত একটি বিভাগের নিয়োগের বোর্ডে প্রার্থীকে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক নিয়ে প্রশ্ন করা হয়। প্রার্থী জবাব দিতে না পারায় তাকে বলা হয় আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়েও জানতে হবে। [তথ্য সংগ্রহের তারিখ: আগস্ট ৪, ২০১৬]

---

[৩৯] এই গবেষণার আওতাভুক্ত দুটি বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রভাষক পদে নিয়োগ প্রার্থীদের মৌখিক পরীক্ষার পাশাপাশি লিখিত পরীক্ষাও অংশগ্রহণ করতে হয়।

৩.২.৪.৪ নিয়োগ বোর্ড কর্তৃক বাছাইকৃত প্রার্থীদের নিয়োগের সুপারিশ

৩.২.৪.৪.১ বিজ্ঞপ্তির অতিরিক্ত শিক্ষক নিয়োগের সুপারিশ

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে একটি অভিযোগ হচ্ছে বিজ্ঞপ্তির অতিরিক্ত নিয়োগ দেওয়া। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে নিয়ম রয়েছে যে, বিজ্ঞপ্তিতে যে কয়টি পদে নিয়োগ দেওয়ার কথা উল্লেখ থাকে বিভাগীয় প্রধানের সুপারিশের ভিত্তিতে একজন শিক্ষক বেশি নিয়োগ দেওয়া যাবে। কিন্তু ১৩টি বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে ১১টিতে এই নিয়ম লঙ্ঘন করে একের অধিক অতিরিক্ত শিক্ষক নিয়োগের সুপারিশ করার উদাহরণ রয়েছে। বিজ্ঞপ্তির অতিরিক্ত শিক্ষক নিয়োগের সুপারিশের এই চিত্র পূর্বে দেখা গেলেও ২০০১ সালের পর থেকে তা ক্রমাগত বৃদ্ধি পেয়েছে। পূর্বে এই অতিরিক্ত শিক্ষক নেওয়া হতো বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নতি ও কল্যাণের কথা চিন্তা করে। কিন্তু উল্লেখিত সময়ে এই অতিরিক্ত নিয়োগ ভোট বৃদ্ধি বা ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলের সমর্থক ও শিক্ষকদের একাংশের অনুসারী তৈরির উদ্দেশ্যে করা হয়। যখন ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক মতাদর্শের অনুসারী প্রার্থীর সংখ্যা বেশি পাওয়া যায় তখন এই সুপারিশের সংখ্যা বেশি হয়। আবার ক্ষমতাসীন দলে অনুসারী প্রার্থীর সংখ্যা বিজ্ঞপ্তির তুলনায় কম থাকলে বিজ্ঞপ্তির সংখ্যার চেয়ে কম শিক্ষকের জন্য সুপারিশ করা হয়। এমন অনেক শিক্ষক নেওয়া হয় যাদের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্গানোগ্রামে পদ থাকে না। কিন্তু অস্থায়ী পদে নিয়োগ দিয়ে পরবর্তীতে ইউজিসি'র অনুমোদন নিয়ে তাদের স্থায়ী করা হয়। অথচ শিক্ষক নিয়োগের যে চাহিদা দেওয়া হয় তা বিবেচনা না করে একই রাজনৈতিক মতাদর্শের অনুসারী তৈরির মাধ্যমে ভোট বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে অতিরিক্ত নিয়োগের সুপারিশ করা হয়। কোনো কোনো বিভাগে চাহিদা না থাকলেও বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত নিয়ম লঙ্ঘন করে প্রশাসন থেকে চাপ প্রয়োগ করা হয় বিভাগীয় চেয়ারম্যান বা প্রধানের নিকট থেকে নিয়োগের চাহিদা পেশ করার জন্য।

বিজ্ঞপ্তির অতিরিক্ত নিয়োগের আরেকটি কারণ হচ্ছে বোর্ডের সকল সদস্যের মন রক্ষা করা। কখনও কখনও উপাচার্যের ওপরে কোনো প্রার্থীকে নিয়োগের জন্য রাজনৈতিক বা স্থানীয় কোনো নেতা বা কোনো প্রভাবশালী শিক্ষকের এত বেশি চাপ থাকে যে উপাচার্যের পক্ষে তা এড়ানো সম্ভব হয় না। আবার বিশেষজ্ঞগণও তাদের পূর্ব নির্ধারিত পছন্দের প্রার্থীদের (পকেট ক্যান্ডিডেট) নিয়োগ দেওয়ার জন্য চাপ সৃষ্টি করে থাকে। বিশেষজ্ঞদের পছন্দের প্রার্থীরা সাধারণত নিজস্ব বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাশকৃত বা একই অঞ্চলের বা আত্মীয় বা তাদের একই মতাদর্শের অনুসারী হয়ে থাকে। যেমন - একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো শিক্ষক যদি বিশেষজ্ঞ হিসেবে অন্য একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে যান তবে তিনি তাঁর নিজস্ব বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো প্রার্থীকে নিয়োগ দেওয়ার চেষ্টা করেন। আবার কখনও কখনও বিশেষজ্ঞগণ তাঁর এলাকার প্রার্থীদের নিয়োগ দেওয়ার চেষ্টা করেন। এভাবে উপাচার্যের নিজস্ব প্রার্থী, প্রভাবশালী শিক্ষকের প্রার্থী, রাজনৈতিক নেতাদের পছন্দের প্রার্থী, বিশেষজ্ঞের পছন্দের প্রার্থী, বিভাগীয় প্রধানের পছন্দের প্রার্থী সকলকেই নিয়োগের চেষ্টা করা হয়। বিজ্ঞপ্তির সময়ে কম সংখ্যক প্রার্থীর জন্য বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হলেও সকল পক্ষের মন রক্ষার জন্য অতিরিক্ত নিয়োগের সুপারিশ করা হয়। বিশ্বদ্যিালয়গুলোতে কখনও কখনও দ্বিগুণ এবং ক্ষেত্রবিশেষে তিনগুণ পর্যন্ত বিজ্ঞপ্তির অতিরিক্ত শিক্ষক নিয়োগের সুপারিশ করার দৃষ্টান্ত রয়েছে।

এ ধরনের অতিরিক্ত নিয়োগ ঠেকাতে বা নিয়োগ বোর্ডের কোনো সদস্য যদি নিয়োগের জন্য যেসব প্রার্থীদের পক্ষে সুপারিশ করে তাতে সম্মত না হন তাহলে উপযুক্ত যুক্তি সহকারে ‘নোট অব ডিসেন্ট[৪০]’ দিতে পারেন। কিন্তু গবেষণায় দেখা যায়, শিক্ষকরা প্রশাসনের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখা এবং তাদের নিজের চাকুরি ঝামেলামুক্ত রাখার জন্য ‘নোট অফ ডিসেন্ট’ দিতে ভয় পান। কারণ ‘নোট অব ডিসেন্ট’ দিলে পরবর্তীতে তাদের বিভিন্ন ধরনের হয়রানির শিকার হতে হয়। প্রাপ্ত তথ্য থেকে দেখা গেছে যে, কোনো কোনো ক্ষেত্রে শিক্ষকরা ‘নোট অব ডিসেন্ট’ দিয়েছেন কিন্তু তার ফলে তাদের পদোন্নতি প্রলম্বিত হয়েছে, প্রাপ্য ছুটি দিতে অস্বীকৃতি জানানো হয়েছে, বিদেশে পিএইচডি বা স্নাতকোত্তর করার সুযোগ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ রয়েছে। এসব বিবেচনায় ‘নোট অব ডিসেন্ট’ দেওয়ার প্রবণতা তাই হ্রাস পেয়েছে। তাছাড়া বর্তমানে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে নিয়োগ বোর্ডের সদস্যদের মধ্যে সমঝোতা ও আঁতাতের মাধ্যমে সকল সদস্যদের পছন্দমতো প্রার্থী নিয়োগ চূড়ান্ত করার কারণে ‘নোট অব ডিসেন্ট’ দেওয়ার প্রয়োজন হয় না। যেমন - কোনো নিয়োগ বোর্ডে উপাচার্য বা উপ-উপাচার্য, ডিন, বিভাগীয় প্রধানের প্রার্থী ও বিশেষজ্ঞদে সকলের পছন্দের প্রার্থীদের নিয়োগ দেওয়া হয়। নিয়োগ বোর্ডের সব সদস্যের অভিপ্রায় মোতাবেক প্রার্থী বাছাই করার সুযোগ থাকায় বোর্ডের কোনো সদস্যের পক্ষ থেকে ‘নোট অব ডিসেন্ট’ দেওয়ার সুযোগ নষ্ট হয়।

---

[৪০] নোট অফ ডিসেন্ট হচ্ছে নিয়োগের প্রার্থী মনোনয়নের বিষয়ে আপত্তি উত্থাপন করা। যখন নিয়োগ বোর্ডের কোনো সদস্য নিয়োগে মনোনীত কোনো প্রার্থী সম্পর্কে একমত না হন এবং তিনি কেন একমত নন সে সকল বিষয় বিস্তারিত উল্লেখ করে নোট দেন সেই নোটকেই ‘নোট অব ডিসেন্ট’ বলা হয়।

৩.২.৫ ধাপ ৬. নিয়োগের সুপারিশ চূড়ান্ত অনুমোদন

সাধারণত নিয়োগ বোর্ড থেকে যেসব প্রার্থীদের নিয়োগের জন্য সুপারিশ করা হয় সিন্ডিকেট তা অনুমোদন দিয়ে দেয়। পূর্বে কখনও নিয়োগ বোর্ডের কোনো সদস্য কোনো প্রার্থীর নিয়োগের বিষয়ে ‘নোট অব ডিসেন্ট’ দিলে সিন্ডিকেট তা বিবেচনায় নিয়ে বোর্ডের সকল সদস্যদের সম্মতির জন্য পুনর্বিবেচনার জন্য নিয়োগ কমিটির নিকট তা ফেরত পাঠাতো এবং বোর্ডের সকল সদস্যের অনুমোদনে নিয়োগ সম্পন্ন করা হতো, অন্যথায় উক্ত নিয়োগ বাতিল হয়ে যেতো। ‘নোট অফ ডিসেন্ট’কে এমনভাবে গুরুত্ব দেওয়া হতো যে তা এক ধরনের রেওয়াজ বা প্রথায় পরিণত হয়েছিল। কিন্তু ২০০১ সালের পর থেকে এই চিত্র পরিবর্তন হতে শুরু করে। বিশ্ববিদ্যালয়ে সিনেট, সিন্ডিকেট ও ডিন নির্বাচনের ক্ষেত্রে একই রাজনৈতিক মতাদর্শের ভোট বৃদ্ধির প্রবণতা থেকে বর্তমানে ‘নোট অব ডিসেন্টে’র বিষয়গুলোকে গুরুত্ব দেওয়া হয় না। যেহেতু নিয়োগ বোর্ডের অধিকাংশের অনুমোদন হলেই যেকোনো নিয়োগ দেওয়া সম্ভব সেহেতু বর্তমান সময়ে নিয়োগ বোর্ডের সদস্যরা ‘নোট অব ডিসেন্ট’ দিলেও তেমন গুরুত্বসহকারে দেখা হয় না। তাই ‘নোট অব ডিসেন্ট’কে পুনরায় যাচাই-বাছাই না করেই নিয়োগের জন্য চূড়ান্ত অনুমোদন দেওয়া হয়। প্রাপ্ত তথ্যে দেখা যায়, ১৩টি বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে ১২টি ‘নোট অব ডিসেন্ট’কে গুরুত্বসহকারে বিবেচনা করা হয় না। আবার যেহেতু ‘নোট অব ডিসেন্টে’র কোনো কার্যকরতা নেই সেহেতু নিয়োগের ক্ষেত্রে পক্ষপাতিত্ব বা অনিয়ম হলেও কেউ ‘নোট অব ডিসেন্ট’ দিতে আগ্রহ হাড়িয়ে ফেলেন।

নিয়োগের চূড়ান্ত অনুমোদনের ক্ষেত্রে আরেকটি অনিয়ম হচ্ছে নিয়ম-বহির্ভূতভাবে বা অযৌক্তিকভাবে বিজ্ঞপ্তির অতিরিক্ত নিয়োগের সুপারিশ অনুমোদন দিয়ে নিয়োগ দান। গবেষণায় দেখা গেছে পাঁচটি বিশ্ববিদ্যালয়ে চৌদ্দটি বিভাগের জন্য ৪৪টি পদের বিপরীতে ৯২ জন প্রভাষক নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে যা দ্বিগুণেরও বেশি। একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে দেখা গেছে, সাতটি বিভাগের সাতটি পদের বিপরীতে ১৭ জন প্রভাষক নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। অপর একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে দু’টি বিভাগে আটজনের বিপরীতে ১৭ জন নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। আরেকটি বিশ্ববিদ্যালয়ে বিজ্ঞপ্তিতে দশজন নিয়োগের কথা উল্লেখ করে ২৯ জন নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। অতি সম্প্রতি একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে চারজনের বিপরীতে নয়জন নেওয়ার তথ্য রয়েছে।[৪১]

৩.৩ অনিয়ম-দুর্নীতির উপাদান বা প্রভাবক

গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্যে দেখা যায় বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়োগের ক্ষেত্রে যেসব অনিয়ম-দুর্নীতি সংঘঠিত হয় তার পেছনে কতগুলো উপাদান বা প্রভাবক কাজ করে। বর্তমান গবেষণায় দেখা গেছে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রভাষক নিয়োগে মোটা দাগে মোট পাঁচটি উপাদান কাজ করে। এগুলো হলো ক. রাজনৈতিক মতাদর্শ, খ. স্বজনপ্রীতি বা আত্মীয়করণ, গ. আঞ্চলিকতা, ঘ. অবৈধ আর্থিক লেনদেন ও ঙ. ধর্মীয় পরিচয়। নিম্নে এসব উপাদান বা প্রভাবকগুলো সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো:

৩.৩.১. রাজনৈতিক মতাদর্শ

গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্যে দেখা যায়, প্রভাষক নিয়োগের ক্ষেত্রে ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলের মতাদর্শ সর্বদাই একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রভাবক হিসেবে কাজ করে। বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রভাষক নিয়োগের ক্ষেত্রে যে বিষয়টি সবচেয়ে বেশি প্রাধান্য দেওয়া বা গুরুত্বসহকারে দেখা হয় তা হচ্ছে প্রার্থীরা কোন রাজনৈতিক মতাদর্শের অনুসারী এবং তারা ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক মতাদর্শের ভোট বৃদ্ধিতে সহায়ক হবে কিনা। গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়ের এক বা একাধিক বিভাগে ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক মতাদর্শের শিক্ষকদের ‘দলভারী’ করার উদ্দেশ্যে উপাচার্য, উপ-উপাচার্য, ডিন, বিভাগীয় চেয়ারম্যান ও বিশেষজ্ঞ তাঁদের পছন্দের বা একই রাজনৈতিক মতাদর্শের প্রার্থীদের নিয়োগ প্রদান করেন। এক্ষেত্রে শুধু প্রার্থীর রাজনৈতিক মতাদর্শ নয় তার পরিবারের সদস্যগণ কোন রাজনৈতিক মতাদর্শের অনুসারী বা সমর্থক বা তার কোনো দূরের আত্মীয়ের রাজনৈতিক মতাদর্শ কী তাও বিবেচনা করা হয়। এমনকি কোনো প্রার্থীর থিসিসের সুপারভাইজার কোন রাজনৈতিক মতাদর্শ অনুসরণ করেন তাও প্রভাষক নিয়োগের ক্ষেত্রে খতিয়ে দেখা হয়। সংশ্লিষ্ট বিশ্বদ্যালয়ের প্রশাসন ও গোয়েন্দা সংস্থার মাধ্যমেও চাকরি প্রার্থীদের রাজনৈতিক মতাদর্শের বিষয়টি যাচাই করা হয়। এমনকি আবেদনকারী প্রার্থীরাও অন্য প্রার্থীদের মতাদর্শ সম্পর্কিত তথ্য বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনকে জানিয়ে থাকেন। বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হওয়ার পর থেকেই প্রার্থীরা চেষ্টা চালান যে তারা ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক মতাদর্শের কতখানি অনুসারি তা প্রমাণ করার জন্য। এ জন্য চাকরি প্রার্থীরা তাদের সাধ্যমতো ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলের মন্ত্রী, সংসদ সদস্য বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রভাবশালী শিক্ষক, ছাত্র নেতা, স্থানীয় নেতাদের মাধ্যমে সুপারিশ করানোর চেষ্টা করে। আর

---

[৪১] *প্রথম আলো*, নভেম্বর ৩, ২০১৬।

এসব প্রভাবশালী ব্যক্তিগণ তাদের মতাদর্শের অনুসারী প্রার্থীদের নিয়োগের জন্য উপাচার্য, উপ-উপাচার্য, ডিন, বিভাগীয় চেয়ারম্যান, বিশেষজ্ঞসহ সংশ্লিষ্টদের চাপ প্রয়োগ করে থাকেন।

৩.৩.২ স্বজনপ্রীতি

বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রভাষক নিয়োগে অনিয়মের একটি গুরুত্বপূর্ণ নির্ধারক হচ্ছে স্বজনপ্রীতি বা পরিবারের সদস্য ও আত্মীয়দেরকে প্রভাষক হিসেবে নিয়োগ প্রদান। সাধারণত বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের সন্তান, স্বামী, স্ত্রী, ভাই, বোন, জামাতা, শ্যালক, শ্যালিকাদেরকে নিয়োগের জন্য বিজ্ঞপ্তির পর থেকেই সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের সাথে বিভিন্ন ধরনের তদবির শুরু করা হয়। এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় প্রধান, ডিন, উপাচার্য, শিক্ষক সমিতির প্রভাবশালী সদস্য, মন্ত্রী, সংসদ সদস্য, স্থানীয় রাজনৈতিক নেতাসহ অন্যান্য সংশ্লিষ্ট অংশীজনের সাথে তদবির করার মাধ্যমে তাদের আত্মীয়-স্বজনদের নিয়োগ দেওয়া উদাহরণ রয়েছে।

বক্স ৩.১৪: স্বজনপ্রীতির উদাহরণ

একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি বিভাগে একই বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্য একটি বিভাগে কর্মরত এক শিক্ষকের শ্যালককে নিয়োগ দেওয়া হয়। এই নিয়োগে সহকর্মীদের আত্মীয়তাকে প্রাধান্য দিতে গিয়ে নিজস্ব বিশ্ববিদ্যালয়ের একাধিক অপেক্ষাকৃত মেধাবী প্রার্থীদের বঞ্চিত করা হয়। উল্লেখ্য, দু'জন প্রার্থীর নাম এক হওয়ায় সকলের ধারণা ছিলো নিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের মেধাবী প্রার্থীকে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু নিয়োগ কমিটি কর্তৃক সুপারিশকৃত ব্যক্তি প্রার্থীদের মধ্যে অপেক্ষাকৃত কম যোগ্যতাসম্পন্ন ও একজন শিক্ষকের শ্যালক - এই বিষয়টি জানাজানি হয়ে গেলে শিক্ষকরা প্রতিবাদ করেন এবং চূড়ান্ত নিয়োগ স্থগিত করা হয়। তবে পরবর্তীতে একজন শিক্ষক শিক্ষা ছুটি নিয়ে বিদেশে গেলে উক্ত পদের বিপরীতে উক্ত ব্যক্তিই নিয়োগ পান। [তথ্যসূত্র ও তথ্য সংগ্রহের তারিখ: মুখ্য তথ্যদাতা সাক্ষাৎকার, আগস্ট ৪, ২০১৬]

একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভিসি'র সন্তান প্রথম শ্রেণিতে পঞ্চম ছিলেন। নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিতে চারজন নিয়োগের বিষয় উল্লেখ থাকলেও ভিসি তথা নিয়োগ কমিটির সভাপতির সন্তানকে নিয়োগ দেওয়ার জন্য প্রথম থেকে পঞ্চম স্থান অধিকারী পাঁচজনকেই নিয়োগ দেওয়া হয়। [তথ্যসূত্র ও তথ্য সংগ্রহের তারিখ: মুখ্য তথ্যদাতা সাক্ষাৎকার, জুলাই ১৮, ২০১৬]

আত্মীয়স্বজনদের নিয়োগের ক্ষেত্রে রাজনৈতিক মতাদর্শ বা আঞ্চলিকতার বিষয়গুলো তেমনভাবে গুরুত্ব পায় না। একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে একজন অধ্যাপকের (বিশেষজ্ঞ) উপস্থিতিতে এবং তার স্বাক্ষরে তার খুব কাছের আত্মীয়কে প্রভাষক হিসেবে নিয়োগের[৪২] জন্য নির্বাচন করা হয়। আত্মীয়দের নিয়োগের বিষয়ে একজন শিক্ষকের মন্তব্য ছিলো, 'আমাদের ছেলে-মেয়েরা যাবে কোথায়, আমরা যদি প্রোভাইড না করি'।

৩.৩.৩ আঞ্চলিকতা

গবেষণায় দেখা গেছে, বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়োগের ক্ষেত্রে প্রার্থী কোন অঞ্চলের তার ওপর নির্ভর করে নিয়োগ দেওয়ার উদাহরণ রয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলো যে এলাকায় অবস্থিত সেই জেলা বা পাশাপাশি জেলার প্রার্থীদেরকে নিয়োগে প্রাধান্য দেওয়া হয়। এছাড়া উপাচার্য, বিশেষজ্ঞ বা নিয়োগ বোর্ডের সদস্যদের জেলা বা এলাকার লোকদের নিয়োগ দেওয়ার প্রবণতা লক্ষণীয়।

গবেষণার তথ্যে আঞ্চলিকতাকে প্রাধান্য দেওয়ার এই চিত্র ঢাকার বাইরের প্রায় সকল সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়েই দেখা গেছে। যেসব ক্ষেত্রে আঞ্চলিকতাকে প্রাধান্য দিয়ে নিয়োগ দেওয়া হয় সেসব ক্ষেত্রে রাজনৈতিক সমর্থন বা মতাদর্শের অনুসারীকে প্রাধান্য দেওয়া হয় না।

---

[৪২] ইউজিসির তদন্ত প্রতিবেদন

বক্স ৩.১৫: আঞ্চলিকতাকে প্রাধান্য দিয়ে নিয়োগের কিছু উদাহরণ

একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি বিভাগের একাধিক যোগ্যতর প্রার্থীকে উপেক্ষা করে বিশ্ববিদ্যালয়ের নিকটবর্তী এলাকার বাসিন্দা হওয়াকে বাড়তি যোগ্যতা ধরে একই বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্য একটি কাছাকাছি ধরনেরবিভাগ থেকে পাশ করা অপেক্ষাকৃত কম যোগ্যতাসম্পন্ন প্রার্থীকে নিয়োগ দেওয়া হয়। [তথ্যসূত্র ও তথ্য সংগ্রহের তারিখ: মুখ্য তথ্যদাতা সাক্ষাৎকার, আগস্ট ২, ২০১৬]

একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি বিভাগে দেশের স্বাধীনতাবিরোধিতাকারী একটি বিশেষ রাজনৈতিক দল সমর্থক একজন চাকুরিপ্রার্থী ছিলেন। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের নিকটবর্তী বা স্থানীয় বাসিন্দা হওয়ায় উক্ত প্রার্থীকে নিয়োগ দেওয়ার জন্য সরকার দলীয় প্রভাবশালী রাজনৈতিক নেতাদের পক্ষ হতেও নিয়োগ সংশ্লিষ্টদের ওপর প্রভাব বিস্তার ও সুপারিশ করা হয়। উক্ত প্রার্থী শিক্ষক হিসেবে নিয়োগও পান। [তথ্যসূত্র ও তথ্য সংগ্রহের তারিখ: মুখ্য তথ্যদাতা সাক্ষাৎকার, আগস্ট ৪, ২০১৬]

একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি নিয়োগ বোর্ডের সভাপতি হিসেবে চাকুরিপ্রার্থীদের মধ্যে অপেক্ষাকৃত কম যোগ্যতাসম্পন্ন একজন স্থানীয় চাকুরিপ্রার্থীকে নিয়োগ দেওয়ার জন্য বোর্ডের অন্যান্য সদস্যদের ওপর চাপ প্রয়োগ করেন। কিন্তু নিয়োগ বোর্ডের বিশেষজ্ঞরা ভিসি'র অভিপ্রায় মোতাবেক উক্ত প্রার্থীকে নিয়োগের জন্য সুপারিশ করতে দ্বিমত প্রকাশ করেন। ভিসি তাঁর পছন্দের প্রার্থীকে নিয়োগ দিতে না পেরে উক্ত নিয়োগ বোর্ড বাতিল করেন। [তথ্যসূত্র ও তথ্য সংগ্রহের তারিখ: মুখ্য তথ্যদাতা সাক্ষাৎকার, আগস্ট ১১, ২০১৬]

কোনো কোনো ক্ষেত্রে দেখা যায়, যেসব বিশ্ববিদ্যালয়ে পূর্বে ওই একই এলাকার প্রার্থীদের বেশি প্রাধান্য দেওয়া হতো সেসব বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্য অন্য জেলার হওয়ার কারণে স্থানীয় প্রার্থীদের নিয়োগ না করার জন্য চেষ্টা অব্যাহত রাখেন। এক্ষেত্রে রাজনৈতিক সমর্থনের চেয়ে আঞ্চলিকতাকে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়। তবে প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান বিষয়গুলো এবং কেন্দ্রিয় পর্যায়ের বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে এই প্রবণতা অনেক কম।

৩.৩.৪ ধর্মীয় পরিচয়

বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়োগের ক্ষেত্রে রাজনৈতিক মতাদর্শ সমর্থনের বিষয়টি যেহেতু অনেক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। আর যেহেতু ধর্মীয় সংখ্যালঘুদেরকে একটি বিশেষ দলের সমর্থক বলে মনে করা হয় সেহেতু কোনো কোনো সরকারের সময়ে তাদের সর্বোচ্চ অ্যাকাডেমিক ফলাফলকে গুরুত্ব না দেওয়ার উদাহরণ রয়েছে। আবার যেহেতু সংখ্যালঘুদের একটি বিশেষ দলের সমর্থক মনে করা হয় সেহেতু সেই দলটি যখন ক্ষমতায় থাকে তখন নিয়োগের ক্ষেত্রে তাদের প্রাধান্য দেওয়ারও দৃষ্টান্ত রয়েছে। যেমন - একটি বিশেষ সময়ে সংখ্যালঘু প্রার্থীদের রেকর্ড পরিমাণ নম্বর থাকেলেও তাদেরকে নিয়োগ না দেওয়ার তথ্য পাওয়া যায়। এমনও দৃষ্টান্ত রয়েছে যে, কোনো বিভাগে এই সরকারের সময়ে কোনো সংখ্যালঘু প্রথম শ্রেণিতে প্রথম স্থান অধিকার করে তাহলে তার নিয়োগ ঠেকানোর জন্য নিয়োগের চাহিদা বা বিজ্ঞাপন দেওয়া হতো না এবং বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হলেও তাদেরকে মৌখিক পরীক্ষার জন্য নির্বাচন না করার অভিযোগ রয়েছে। আবার মৌখিত পরীক্ষার জন্য নির্বাচন করা হলেও মৌখিক পরীক্ষার সময় অবান্তর প্রশ্ন করে হয়রানির মাধ্যমে অযোগ্য বলে প্রমাণ করা এবং এভাবে নিয়োগ থেকে বঞ্চিত করার তথ্য রয়েছে। কখনও কখনও বিশ্ববিদ্যালয়ে

বক্স ৩.১৬: প্রথম শ্রেণিতে প্রথম ও অনুষদে রেকর্ড পরিমাণ নম্বর পেয়েও নিয়োগপ্রাপ্তি হতে বঞ্চিত হওয়া

একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি বিভাগে প্রথম শ্রেণিতে প্রথম স্থান ও অনুষদে রেকর্ড পরিমাণ নম্বর পেয়ে উত্তীর্ণ একজন হিন্দু ধর্মাবলম্বী প্রার্থী সংখ্যালঘু ধর্মীয় সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় একই বিভাগে তিনবার আবেদন করেও নিয়োগ হতে বঞ্চিত হন। প্রথমবার আবেদন করে নিয়োগ পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য তাকে বাছাই করা হয় নি। দ্বিতীয়বার আবেদন করলেও মৌখিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণের সুযোগ পাননি। তখন তিনি লিখিতভাবে কর্তৃপক্ষের নিকট মৌখিক পরীক্ষায় তাকে না ডাকার কারণ সম্পর্কে জানতে চান। মৌখিক পরীক্ষার দিন উক্ত প্রার্থী রেজিস্ট্রারকে ফোন করেও তার কার্ড না পাওয়ার কারণ জানতে চান এবং কার্ড না দেওয়া হলে তিনি আইনের আশ্রয় নেবেন বলে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে জানান। এমতাবস্থায় রেজিস্ট্রার উক্ত প্রার্থীকে নিয়োগ পরীক্ষার ঠিক আগের দিন মৌখিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করার জন্য নিয়োগ বোর্ডে উপস্থিত হতে বলেন। মৌখিক পরীক্ষার দিন মৌখিক পরীক্ষার কার্ড হাতে পান। তাকে মৌখিক পরীক্ষার সময়ে অপ্রাসঙ্গিক প্রশ্ন করে নিয়োগ পাওয়ার সুযোগ হতে বঞ্চিত করা হয়। তবে সরকার পরিবর্তনের পর একই বিভাগে প্রভাষক হিসেবে নিয়োগ পেতে চতুর্থবারের মতো আবেদন করে সফল হন।

[তথ্যসূত্র ও তথ্য সংগ্রহের তারিখ: মুখ্য তথ্যদাতা সাক্ষাৎকার, আগস্ট ৩, ২০১৬]

তাদেরকে নিয়োগ না দেওয়ার জন্য অ্যাকাডেমিক পরীক্ষার ফলাফল সঠিক সময়ে প্রকাশ না করে নিয়োগের পরে প্রকাশ করা হতো যাতে তারা আবেদন করতে ব্যর্থ হয়। সংখ্যালঘুদের নিয়োগ না দেওয়ার বিষয়ে একজন উপাচার্যর মন্তব্য - ‘আমি হিন্দু আর কমুনিস্ট দেখতে পারি না’।

আবার কোনো কোনো সময়ে ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের নিয়োগের সুযোগ দেওয়ার জন্য তাদের প্রাধান্য দেওয়া হয়। যেহেতু সংখ্যালঘুদের মনে করা হয় একটি বিশেষ রাজনৈতিক মতাদর্শের অনুসারী এবং তাদের উক্ত দলের পক্ষে ভোট দেওয়ার নিশ্চিত সম্ভাবনা থাকে সেহেতু এই সময়ে তাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক হিসেবে নিয়োগের জন্য এক ধরনের প্রাধান্য দেওয়ার তথ্য পাওয়া যায়। কোনো ধর্মীয় সংখ্যালঘু যদি নিয়োগের শর্ত পূরণ করে এবং অ্যাকাডেমিক ফলাফল প্রথম দিকের হয় তাহলে তাদেরকে শিক্ষক হিসেবে নেওয়ার চেষ্টা করা হয়।

বক্স ৩.১৭: একটি প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের দু’টি ঘটনা

একটি বিভাগে সংখ্যালঘু ধর্মীয় সম্প্রদায়ভুক্ত একজন প্রার্থী স্নাতক ও স্নাতকোত্তরে রেকর্ড পরিমাণ নম্বর পাওয়ার পরেও তাকে সংখ্যালঘু হওয়ার কারণে দু’বার মৌখিক পরীক্ষায় ভালোকরে নি উল্লেখ করে নিয়োগ দেওয়া হয় নি। উল্লেখ্য, উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রচলিত রেওয়াজ হচ্ছে প্রথম শ্রেণিতে প্রথম স্থান অধিকারী ব্যক্তিকে শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ প্রদান করা হয়। [তথ্যসূত্র ও তথ্য সংগ্রহের তারিখ: মুখ্য তথ্যদাতা সাক্ষাৎকার, আগস্ট ৯-১০, ২০১৬]

অপর একটি বিভাগে সংখ্যালঘু ধর্মীয় সম্প্রদায়ভুক্ত একজন প্রার্থী যিনি প্রথম শ্রেণিতে চতুর্থ স্থান অধিকারী তাকে নিয়োগ দেওয়ার জন্য প্রথম শ্রেণিতে প্রথম ও দ্বিতীয় স্থান অধিকারীদেরকে নিয়োগের সাথে সাথে তৃতীয় স্থান অধিকারীকেও নিয়োগ দেওয়া হয়। [তথ্যসূত্র ও তথ্য সংগ্রহের তারিখ: মুখ্য তথ্যদাতা সাক্ষাৎকার, আগস্ট ৯-১০, ২০১৬]

কখনও কখনও দেখা গেছে সংখ্যালঘুদের নিয়োগের জন্য বিজ্ঞপ্তির অতিরিক্ত শিক্ষক নিয়োগ করা হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রভাষক নিয়োগের এই চিত্র প্রায় প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়ে কম-বেশি প্রযোজ্য।

৩.৩.৫ অবৈধ আর্থিক লেনদেন

সর্বোচ্চ বিদ্যাপিঠ হিসেবে বিশ্ববিদ্যালয়ে সবচেয়ে মেধাবীদের নিয়োগ দেওয়া কাম্য হলেও এই নিয়োগে অবৈধ আর্থিক লেনদেনের অভিযোগ পাওয়া যায়। গবেষণায় ১৩টি বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে আটটি বিশ্ববিদ্যালয়ে আর্থিক লেনদেনের অভিযোগ রয়েছে। এসব বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রভাষক নিয়োগে তিন লক্ষ টাকা থেকে সর্বোচ্চ ২০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত লেনদেনের অভিযোগ রয়েছে।

বক্স ৩.১৮: প্রভাষক হিসেবে নিয়োগের জন্য ১৬ লক্ষ টাকা দাবি

নিয়োগের আবেদনপত্র জমা দেওয়ার কিছুদিন পরে সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন সহকারী অধ্যাপক প্রার্থীকে ফোন করে জানতে চান যে প্রার্থী শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ পেতে চান কিনা। নিয়োগ পেতে হলে ১৬ লক্ষ টাকা দিতে হবে। কিন্তু চাকরি প্রার্থী যখন জানায় যে তার পক্ষে টাকা দেওয়া সম্ভব নয়, তখন ওই শিক্ষক তাকে জানান যে সব টাকা একসাথে দিতে হবে না। নিয়োগের আগে আট লক্ষ টাকা দিতে হবে। বাকি টাকা নিয়োগের পরে কিস্তিতে পরিশোধ করতে হবে। “বকেয়া টাকা পরিশোধের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের কল্যাণ তহবিল থেকে লোন পাইয়ে দিব।” [তথ্যসূত্র ও তথ্য সংগ্রহের তারিখ: মুখ্য তথ্যদাতা সাক্ষাৎকার, মার্চ ৮, ২০১৬]

বক্স ৩.১৯: নিয়োগ পেতে ১০ লক্ষ টাকা

নতুন ও ঢাকার বাইরের একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি হলে একজন প্রার্থী আবেদনের পরে খোঁজ নিয়ে দেখেন সেখানে প্রভাষক পদে নিয়োগের জন্য বিভিন্ন পর্যায়ের লোকদের সাথে তদবির করতে হয় এবং তাদেরকে ঘুষ প্রদানের মাধ্যমে চাকরি পাওয়া সম্ভব। এরপর ওই প্রার্থী স্থানীয় এক নেতার সাথে ১০ লক্ষ টাকায় চুক্তি করেন। এর মধ্যে তিনি ছয় লক্ষ টাকা ওই নেতাকে দিয়ে দেন। কিন্তু ওই বিশ্ববিদ্যালয়ে অন্যান্য প্রার্থীসহ এ ধরনের আর্থিক লেনদেনের বিষয়টি জানাজানি হলে উক্ত নিয়োগ বাতিল হয়ে যায়। [তথ্যসূত্র ও তথ্য সংগ্রহের তারিখ: মুখ্য তথ্যদাতা সাক্ষাৎকার, মার্চ ৮, ২০১৬]

অবৈধ আর্থিক লেনদেনের যে পরিমাণ গবেষণায় উল্লেখ করা হয়েছে তা সাতটি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাওয়া যায়। একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে আর্থিক লেনদেনের পরিমাণ জানা যায় নি। আর্থিক লেনদেনের এই প্রবণতা সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয় এবং তুলনামূলক নতুন বিশ্ববিদ্যালয়ে বেশি দেখা গেছে। তবে এই লেনদেন

গবেষণার আওতাভুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর সকল বিভাগে এবং সকল চাকরি প্রার্থীর ক্ষেত্রে সমানভাবে প্রযোজ্য নয়। কখনও কখনও সংশ্লিষ্ট প্রভাবশালী অংশীজনের মাধ্যমে আর্থিক লেনদেন হলে ভালো অ্যাকাডেমিক ফলাফল, রাজনৈতিক মতাদর্শ, আঞ্চলিকতা, আত্মীয়তার সম্পর্ক ইত্যাদি বিষয় প্রাধান্য পায় না। আবার কোনো কোনো নিয়োগে আর্থিক লেনদেনের সাথে যখন একই রাজনৈতিক মতাদর্শের অনুসারী, আত্মীয় বা একই এলাকার প্রার্থী হয় তখন তার নিয়োগ সহজ হয়ে থাকে। নিয়োগ সংশ্লিষ্ট একজন শিক্ষক প্রার্থীকে চাকরি দেওয়ার বিনিময় প্রসঙ্গে বলেন - 'আমার কিছু লোন আছে, ঐ লোন তুমি শোধ করে দিলে আমার ও তোমার দুই জনেরই উপকার হবে।"

গবেষণায় বিধিবহির্ভূতভাবে আর্থিক লেনদেনের সাথে উপাচার্য, শিক্ষকনেতা, রেজিস্ট্রার অফিসের কর্মকর্তা-কর্মচারী, বিশেষজ্ঞ, ছাত্রনেতা, ক্ষমতাসীন দলের নেতা ও নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের একাংশ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে জড়িত থাকার তথ্য পাওয়া গেছে। তবে এসব ব্যক্তি সাধারণত ঘুষের অর্থ সরাসরি গ্রহণ করেন না। রেজিস্ট্রার অফিসের কর্মকর্তা-কর্মচারী, নিয়োগ কমিটির সদস্যদের একাংশের পরিবারের সদস্য, আত্মীয়, ছাত্রনেতা, স্থানীয় রাজনৈতিক নেতা-কর্মী ইত্যাদির মাধ্যমে নগদে বা ব্যাংক হিসাবের মাধ্যমে অর্থ লেনদেন হয়ে থাকে। এই বিধিবহির্ভূত আর্থিক লেনদেন মূলত মধ্যস্থতাকারীদের মাধ্যমে হয়। তবে এক্ষেত্রে সাধারণত যার যার সুবিধামতো ব্যক্তি ও পদ্ধতিতে আর্থিক লেনদেন হয়ে থাকে।

৩.৪ অনিয়ম-দুর্নীতির সাথে সংশ্লিষ্ট অংশীজন

বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রভাষক নিয়োগের সাথে বিভিন্ন ধরনের অংশীজনের সম্পৃক্ততার তথ্য রয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের অভ্যন্তরীণ অংশীজনের মধ্যে রয়েছে উপাচার্য, উপ-উপাচার্য, অনুষদের প্রধান বা ডিন, বিভাগীয় প্রধান, শিক্ষক সমিতির ক্ষমতাসীন দলের সদস্য, রেজিস্ট্রার কার্যালয়ের কর্মকর্তা-কর্মচারী, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকনেতা, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রনেতাদের একাংশ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। আর বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরের অংশীজনদের মধ্যে মন্ত্রী, আমলা, ইউজিসি, বিশেষজ্ঞ, নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি ও ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলের প্রভাবশালী নেতাদের একাংশ। প্রভাষক নিয়োগের ক্ষেত্রে কখনও কখনও একজন অংশীজনের ভূমিকা প্রধান ভূমিকা পালন করে, আবার কখনও কখনও একাধিক অংশীজনের ভূমিকা প্রাধান্য পায়। এ ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকে উপাচাযের। যেহেতু উপাচার্য বা উপ-উপাচার্যই নিয়োগ বোর্ডে সভাপতিত্ব করেন এবং তার অনুমোদন ছাড়া কোনো নিয়োগ চূড়ান্ত হয় না সেহেতু প্রতিটি নিয়োগে তাঁর ইচ্ছারই প্রতিফলন ঘটে। এ কারণে উপাচার্য বা উপ-উপাচার্যকে প্রভাবিত করার জন্য বিভিন্ন মহল থেকে চাপ প্রয়োগ বা সুপারিশ পাঠানো হয়।

কোনো প্রার্থীকে নিয়োগ দেওয়ার জন্য সরকারের উচ্চ পর্যায়ের ব্যক্তিদের একাংশ, সরকারের উচ্চ পর্যায়ে যোগাযোগ আছে এমন প্রভাবশালী শিক্ষক নেতা, ইউজিসি'র ঊর্ধ্বতন ব্যক্তি, মন্ত্রণালয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা, ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলের একাংশ ও প্রভাবশালী/এলাকার দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রীদের একাংশের মাধ্যমে উপাচার্য বা উপ-উপাচার্য বা নিয়োগ বোর্ডের সদস্যদের চাপ সৃষ্টি বা সুপারিশ করে থাকেন। এরা সরাসরি ফোন করে বা তাদের অধীনস্তদের মাধ্যমে ফোন করে বা লিখিত সুপারিশ করে অথবা ই-মেইলের মাধ্যমে সুপারিশ করে চাপ সৃষ্টি করে থাকেন। অন্যান্য অংশীজনরাও সরাসরি উপাচার্য বা উপ-উপাচার্য, বিশেষজ্ঞ, বিভাগীয় প্রধান বা ডিনদের সাথে যোগাযোগের মাধ্যমে তাদের পছন্দের প্রার্থীকে নিয়োগের অনুরোধ বা সুপারিশ বা তদবির করেন। নিয়োগের ক্ষেত্রে প্রার্থীদের যার যত ধরনের নেটওয়ার্ক বা যোগাযোগ রয়েছে তিনি ততভাবেই চেষ্টা চালান নিয়োগ পাওয়ার জন্য। একটি নিয়োগে একই রাজনৈতিক মতাদর্শের অনুসারী, স্বজনপ্রীতি, আঞ্চলিকতার প্রভাব, আর্থিক লেনদেনসহ একাধিক উপাদান বা প্রভাবক ভূমিকা রাখতে পারে বা একটি উপাদানও কার্যকর হতে পারে যেখানে এক বা একাধিক অংশীজন জড়িত থাকতে পারে। কোন বিষয়টি নিয়োগের জন্য প্রধান উপাদান হিসেবে কাজ করে তা পূর্ব থেকে অনুধাবন বা বোঝার উপায় নেই। যে প্রার্থীর নেটওয়ার্ক যত শক্তিশালী তার নিয়োগের পক্ষের সুপারিশও বেশি শক্তিশালী হয়ে থাকে। সার্বিকভাবে বলা যায়, নিয়োগের ক্ষেত্রে অ্যাকাডেমিক ফলাফলের সাথে সাথে যেসব প্রার্থীর সুপারিশ যত শক্তিশালী থাকে বা যে প্রার্থীর আর্থিক লেনদেন সিদ্ধান্ত গ্রহণকারীকে যত প্রভাবিত করতে পারে তারই নিয়োগ পাওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে।

চিত্র ৩.১: প্রভাষক নিয়োগ সংশ্লিষ্ট অনিয়ম ও দুর্নীতিতে জড়িত অংশীজনের আন্তঃসম্পর্ক

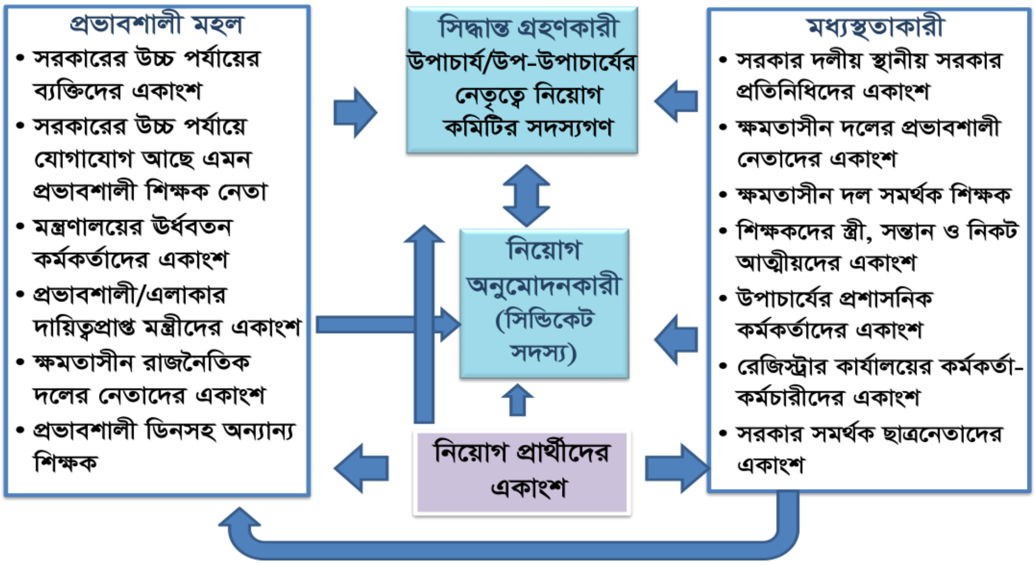
প্রভাবশালী মহল
• সরকারের উচ্চ পর্যায়ের ব্যক্তিদের একাংশ
• সরকারের উচ্চ পর্যায়ে যোগাযোগ আছে এমন প্রভাবশালী শিক্ষক নেতা
• মন্ত্রণালয়ের ঊর্ধবতন কর্মকর্তাদের একাংশ
• প্রভাবশালী/এলাকার দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রীদের একাংশ
• ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলের নেতাদের একাংশ
• প্রভাবশালী ডিনসহ অন্যান্য শিক্ষক
সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী উপাচার্য/উপ-উপাচার্যের নেতৃত্বে নিয়োগ কমিটির সদস্যগণ
নিয়োগ অনুমোদনকারী (সিন্ডিকেট সদস্য)
নিয়োগ প্রার্থীদের একাংশ
মধ্যস্থতাকারী
• সরকার দলীয় স্থানীয় সরকার প্রতিনিধিদের একাংশ
• ক্ষমতাসীন দলের প্রভাবশালী নেতাদের একাংশ
• ক্ষমতাসীন দল সমর্থক শিক্ষক
• শিক্ষকদের স্ত্রী, সন্তান ও নিকট আত্মীয়দের একাংশ
• উপাচার্যের প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের একাংশ
• রেজিস্ট্রার কার্যালয়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের একাংশ
• সরকার সমর্থক ছাত্রনেতাদের একাংশ

উপসংহার

উপরোক্ত আলোচনা থেকে দেখা যায় যে, বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রভাষক নিয়োগের বিভিন্ন ধাপেই কোনো না কোনো অনিয়ম-দুর্নীতির ঘটে থাকে। তবে তা সকল বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল বিভাগের সকল প্রার্থীর জন্য একইভাবে প্রযোজ্য নয়। নিয়োগের চাহিদা নিরূপণ, যাচাই করা, আবেদনের শর্ত নির্ধারণ, বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ, প্রার্থীতা যাচাই, মৌখিক পরীক্ষার নির্বাচন, পরীক্ষা নেওয়া, নিয়োগের সুপারিশ করা এবং চূড়ান্ত অনুমোদন দেওয়া প্রতিটি ক্ষেত্রেই পছন্দের প্রার্থীকে নিয়োগের সর্বাত্মক চেষ্টা অব্যাহত থাকে। এই পছন্দের প্রার্থী হতে পারেন ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক মতাদর্শের অনুসারী বা প্রভাবশালী কোনো অংশীজনের আত্মীয় বা তাদের এলাকার প্রার্থী কিংবা এমন কোনো প্রার্থী যিনি আর্থিক লেনদেনের মাধ্যমে তার নিয়োগ নিশ্চিত করতে পারেন। প্রতিটি সরকারের সময়েই ক্ষমতাসীন দলের ভোট বৃদ্ধি বা অনুসারী বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে সর্বোচ্চসংখ্যক নিয়োগ প্রদানের চেষ্টা অব্যাহত থাকে। ক্ষমতাসীন প্রশাসন এই নিয়োগ দেওয়ার জন্য নিজেদের মতো করে প্রশাসনে পরিবর্তন আনার সাথে সাথে প্রভাষক নিয়োগ সংশ্লিষ্ট নিয়ম-কানুন পরিবর্তনের মাধ্যমে নিয়োগ প্রদান করে থাকে। গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত বিশ্ববিদ্যালসমূহে প্রভাষক নিয়োগে চাকুরিপ্রার্থীদের রাজনৈতিক পরিচয় কিংবা ক্ষমতাসীন দলের সাথে সম্পৃক্ততার বিষয়টি প্রভাষক পদে নির্বাচিত করার ক্ষেত্রে সর্বাধিক লক্ষণীয়। তবে বিধিবহির্ভূতভাবে আর্থিক লেনদেনের মাধ্যমে নিয়োগের ক্ষেত্রে অ্যাকাডেমিক ফলাফল, রাজনৈতিক মতাদর্শ, ধর্মীয় পরিচয়, আঞ্চলিকতা, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের সাথে পারিবারিক বা আত্মীয়তার সম্পর্ক ইত্যাদি নির্ধারকের কোনো গুরুত্ব থাকে না। এক্ষেত্রে চাকুরিপ্রার্থীর সাথে নিয়োগ সংশ্লিষ্টদের একাংশ কর্তৃক সরাসরি বা মধ্যস্থতাকারীর মাধ্যমে দরকষাকষি করে অর্থের পরিমাণ নির্ধারণ ও তা সংগ্রহের বিষয়টিই মুখ্য হয়ে দাড়ায়।

চতুর্থ অধ্যায়
উপসংহার ও সুপারিশ

৪.১ উপসংহার

জীবনে সফলতা অর্জন এবং জাতি গঠনে নেতৃত্বদানের দিক-নির্দেশনা শিক্ষার্থীরা তাদের শিক্ষক বিশেষ করে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের শিক্ষকদের নিকট থেকে পেয়ে থাকে। একজন ভালো শিক্ষক তাদের শিক্ষার্থীদের অ্যাকাডেমিক শিক্ষার পাশাপাশি দেশ গঠনের বিভিন্ন নীতি বিষয়েও শিক্ষাদান করে থাকেন। কিন্তু সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রভাষক নিয়োগের যে অনিয়ম-দুর্নীতির তথ্য পাওয়া যায় তাতে অনেক ক্ষেত্রেই শিক্ষার্থীরা যোগ্য শিক্ষক এবং তাদের প্রদত্ত সঠিক শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হয়। সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় স্বায়ত্বশাসিত হওয়ায় প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসন সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যাকাডেমিক কাউন্সিল ও সিন্ডিকেটের অনুমোদনসাপেক্ষে নিয়োগ বিধিমালা প্রয়োজন কিংবা অভিপ্রায় মোতাবেক সংশোধন, পরিবর্তন ও নতুন শর্ত সংযোজন বা বিয়োজন করতে পারে। এসব কার্যক্রমের ওপর শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও ইউজিসিসহ সরকারি কোনো প্রতিষ্ঠানের নজরদারি করার এখতিয়ার নেই। এমতাবস্থায় প্রভাষক নিয়োগ কার্যক্রমে অনিয়ম ও দুর্নীতির ঘটনা দেখভাল করার জন্য কার্যকর কোনো জবাবদিহিতামূলক ব্যবস্থা ও কার্যকর কর্তৃপক্ষের উপস্থিতি প্রত্যক্ষ করা যায় নি।

গবেষণায় দেখা যায়, প্রভাষক নিয়োগের প্রতিটি ধাপে অনিয়ম ও দুর্নীতির অনুকূল উপাদান (‘রেড ফ্ল্যাগ’) যেমন- নিয়োগ কমিটিতে ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক সমর্থনকারী ও পছন্দের ব্যক্তিদের আধিক্য হওয়ার সুযোগ, নিয়োগ কমিটি বাতিল ও পুনর্গঠন, নিয়োগ যোগ্যতায় ইচ্ছামাফিক হ্রাস-বৃদ্ধি ও শর্ত অন্তর্ভুক্ত করার সুযোগ, নিয়োগ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের ইচ্ছামাফিক এবং ক্ষেত্রবিশেষে ব্যক্তি, গোষ্ঠী বা সরকার সমর্থক রাজনৈতিক দলের স্বার্থে ক্ষমতা প্রয়োগের সুযোগ, সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদত্ত স্বায়ত্বশাসন অপব্যবহারের সুযোগ এবং তথ্যের উন্মুক্ততানা থাকা ইত্যাদি প্রত্যক্ষ করা যায়। এসব উপাদান প্রভাষক নিয়োগে অনিয়ম-দুর্নীতির সুযোগ সৃষ্টিতে ভূমিকা পালন করে থাকে। এর পাশাপাশি সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে অস্বচ্ছভাবে ও রাজনৈতিক বিবেচনায় উপাচার্য নিয়োগের ঘটনাও প্রভাষক নিয়োগে অনিয়ম ও দুর্নীতির ক্ষেত্র সৃষ্টির অন্যতম কারণ হিসেবে প্রত্যক্ষ করা গেছে। এমতাবস্থায় প্রভাষক নিয়োগ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের একাংশ সংঘবদ্ধভাবে পুরো প্রক্রিয়া নিজের আওতায় এনে ও প্রভাবিত করে নিজেদের অভিপ্রায় মোতাবেক পছন্দের চাকরি প্রার্থীদের নিয়োগ দেওয়ার প্রবণতা সাধারণ চর্চায় পরিণত হয়েছে। নিয়োগ কমিটির প্রধানসহ নিয়োগ সংশ্লিষ্টদের একাংশের সংঘবদ্ধ প্রয়াসে রাজনৈতিক মতাদর্শ, আঞ্চলিকতা, ধর্মীয় পরিচয়, শিক্ষকদের সাথে আত্মীয়তার সম্পর্ক ইত্যাদি বিবেচনায় ও বিধিবহির্ভূতভাবে অর্থ লেনদেনের মাধ্যমে নির্দিষ্ট প্রার্থী বা প্রার্থীদের নিয়োগ দেওয়ার ঘটনাও ঘটতে দেখা যায়। এছাড়াও প্রভাষক নিয়োগে বিজ্ঞাপ্তিত পদের অতিরিক্ত নিয়োগ, বিজ্ঞপ্তি ছাড়া নিয়োগ, অপেক্ষাকৃত মেধাবীদের ইচ্ছাকৃতভাবে বাদ দিয়ে কম মেধাবীদের নিয়োগ প্রদান ইত্যাদি ঘটনাও প্রত্যক্ষ করা যায়।

চিত্র ৪.১: প্রভাষক নিয়োগে অনিয়ম ও দুর্নীতির কারণ, ফলাফল ও প্রভাব

কারণ

- পূর্ণাঙ্গ নিয়োগ বিধিমালার অনুপস্থিতি ও অস্পষ্টতা
- বিদ্যমান আইন মোতাবেক সিন্ডিকেটে সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যদের একই রাজনৈতিক মতাদর্শের অনুসারীদের অনুপ্রবেশের সুযোগ
- অ্যাকাডেমিক ফলাফল প্রভাবিতকরণের সুযোগ
- নোট অব ডিসেন্ট বিবেচনায় না নেওয়া ও এর সুযোগ নষ্ট হওয়া
- কার্যকর জবাবদিহিতার ব্যবস্থার অভাব
- নিয়োগ বিধিমালা লঙ্ঘের কার্যকর শাস্তির ব্যবস্থা না থাকা
- তথ্য জানার সুযোগ না থাকা

ফলাফল

- উদ্দেশ্যমূলকভাবে নিয়োগের যোগ্যতা নির্ধারণ ও পরিবর্তন
- নিয়োগ কমিটিতে সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যদের একই রাজনৈতিক মতাদর্শের প্রতিনিধিত্ব
- প্রার্থীদের সমান সুযোগ না দেওয়া
- অনুসারী ও ভোটার বৃদ্ধির জন্য রাজনৈতিক মতাদর্শ, স্বজনপ্রীতি, আঞ্চলিকতা, ধর্মীয় পরিচয় ও অর্থ লেনদেনের মাধ্যমে নিয়োগ
- বিজ্ঞপ্তির অতিরিক্ত নিয়োগ
- তুলনামূলক কম যোগ্য প্রার্থীর শিক্ষক হিসেবে নিয়োগের সুযোগ

প্রভাব

- যোগ্যতায় ঘাটতি থাকায় মাননম্মত পাঠদান ব্যাহত
- মানসম্পন্ন গবেষণা না হওয়া
- উচ্চশিক্ষার পরিবেশ রাজনীতিকরণ ও প্রাতিষ্ঠানিক অবক্ষয়
- শিক্ষার গুণগত মান হ্রাস
- দুর্নীতির প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভ করার ঝুঁকি সৃষ্টি

গবেষণায় প্রভাষক নিয়োগ প্রক্রিয়ার প্রায় সব ধাপে অনিয়ম ও দুর্নীতির সুযোগ থাকায় অপেক্ষাকৃত অধিক যোগ্য প্রার্থীদের শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ পাওয়ার সুযোগ হতে বঞ্চিত হওয়ার ঘটনা প্রত্যক্ষ করা গেছে। এছাড়া নিয়োগ কর্মকাণ্ডে স্বচ্ছতা ও কার্যকর জবাবদিহিতা না থাকায় চাকুরি প্রার্থীদের একাংশ অপেক্ষাকৃত কম মেধাবী বা যোগ্যতাসম্পন্ন হয়েও শিক্ষক হওয়ার সুযোগ করে নিচ্ছে। এসব কারণে কোনো কোনো সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রভাষক নিয়োগে অনিয়ম ও দুর্নীতি কার্যত প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভ করেছে।

সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে অনিয়ম ও দুর্নীতির স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। গবেষণায় দেখা যায় অনিয়ম ও দুর্নীতির মাধ্যমে নিয়োগপ্রাপ্ত শিক্ষকরা অনেক ক্ষেত্রেই শ্রেণিকক্ষে ভালোভাবে পাঠদানে সক্ষম হন না কিংবা দায়সাড়াভাবে পাঠদান করেন এমনকি নানা অযুহাতে যেমন - প্রশাসনিক কাজে ব্যস্ততা, সাংস্কৃতিক কাজে সম্পৃক্ততা, নিয়মিত ক্লাস না নেওয়া, শ্রেণিকক্ষে উপস্থিত হতে অনীহা, প্রস্তুতি না নিয়ে শ্রেণিকক্ষে উপস্থিত হওয়া, পরীক্ষার খাতা যথাযথভাবে মূল্যায়ন না করা, গবেষণা কার্যক্রম ও মানসম্মত প্রকাশনায় উদ্যোগী না হওয়া, অনুসারী তৈরিতে উদ্যোগী হওয়া ও শিক্ষক রাজনীতিতে অধিকতর সময় ব্যয় করছেন। এছাড়া দুর্নীতির মাধ্যমে নিয়োগ পাওয়া শিক্ষকদের একাংশ বিশ্ববিদ্যালয়ভিত্তিক শিক্ষক রাজনীতি ও প্রশাসনের সহায়ক ও বিশ্বস্ত থেকে নিজেদের পদোন্নতি ও বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা যেমন - বিভিন্ন হলসহ অন্যান্য প্রশাসনিক পদপ্রাপ্তি ইত্যাদি আদায়ে অধিকতর মনোযোগী হচ্ছেন। প্রভাষক নিয়োগে অনিয়ম ও দুর্নীতির ঘটনা সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠ হিসেবে সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষাদানসহ শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের জ্ঞান অর্জনের সহায়ক পরিবেশ ব্যাহত হচ্ছে বলে গবেষণায় প্রতীয়মান হয়েছে।

তবে বেশিরভাগ বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রভাষক নিয়োগের ক্ষেত্রে উপরের চিত্র পাওয়া গেলেও কোনো কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে ইতিবাচক চর্চাও লক্ষণীয়। এসব বিশ্ববিদ্যালয়ে বিধিমালা যথাযথ অনুসরণ করা ও চাকরি প্রার্থীদের অ্যাকাডেমিক ফলাফলকে প্রাধান্য দিয়ে অপেক্ষাকৃত যোগ্যতর প্রার্থীদের নিয়োগ দেওয়ার তথ্যও গবেষণায় উঠে এসেছে। ইতিবাচক চর্চার ক্ষেত্রে প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের চিত্র সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনায় অধিক লক্ষ্যণীয়।

৪.২ সুপারিশ

১. **পূর্ণাঙ্গ নীতিমালা বা নির্দেশিকা প্রণয়ন:** প্রভাষক নিয়োগের জন্য উন্নত বিশ্বের বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক নিয়োগের ন্যায় একটি পূর্ণাঙ্গ নীতিমালা বা নির্দেশিকা প্রণয়ন করতে হবে এবং তা কার্যকর করতে হবে। উক্ত নীতিমালায় নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ অন্তর্ভুক্ত করতে হবে:

বিষয়	করণীয়
নিয়োগ চাহিদা যাচাই ও উপস্থাপন	বিদ্যমান নিয়ম অনুযায়ী শিক্ষকদের কর্মভার সঠিকভাবে বিবেচনা করে শিক্ষক নিয়োগের চাহিদা উপস্থাপন করতে হবে। নিয়োগের চাহিদা সঠিকভাবে যাচাইয়ের ব্যবস্থা করতে হবে। চাহিদা তৈরি ও যাচাইয়ের জন্য কার্যকর জবাবদিহিতার ব্যবস্থা থাকতে হবে।
আবেদনের যোগ্যতা	প্রভাষক পদে আবেদন করার যোগ্যতা বা নিয়ম পূর্ব থেকে সুনির্দিষ্ট করতে হবে। এক্ষেত্রে ‘বিশেষ যোগ্যতা’ উল্লেখের মাধ্যমে প্রাধান্যের সুযোগ না রাখা বাঞ্ছনীয়। তবে অপরিহার্য ক্ষেত্রে ‘বিশেষ যোগ্যতা’ বলতে কী বোঝানো হবে তা সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ থাকতে হবে।
নিয়োগ কমিটি গঠন	প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য নিয়োগ কমিটি গঠনের সুনির্দিষ্ট নীতিমালা প্রণয়ন করতে হবে। উক্ত নীতিমালায় নিয়োগ কমিটিতে যেসব বিশেষজ্ঞ থাকবেন তাদেরকে কোন যোগ্যতার ভিত্তিতে মনোনয়ন করা হবে তা সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ থাকতে হবে। বিদ্যমান নিয়োগ বোর্ড বা কমিটি পুনর্গঠন করতে হবে। কমিটিতে যাঁরা থাকবেন - ক. সংশ্লিষ্ট অনুষদের ডিন (যিনি জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নিয়োগ পাবেন); খ. সংশ্লিষ্ট বিভাগের চেয়ারম্যান; গ. সংশ্লিষ্ট বিভাগের জ্যেষ্ঠতম শিক্ষক (চেয়ারম্যান একই ব্যক্তি হলে অন্য শিক্ষক) যাকে পর্যায়ক্রমে এক বছরের জন্য অন্তর্ভুক্ত করা; ঘ. সংশ্লিষ্ট বিভাগের অ্যাকাডেমিক কমিটি কর্তৃক মনোনীত সংশ্লিষ্ট বিষয়ে একজন বহিরাগত বিশেষজ্ঞ।

বিষয়	করণীয়
বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ	প্রধান প্রধান সংবাদপত্র, নিউজ পোর্টাল বা জব পোর্টাল ও বিশ্ববিদ্যালয়ে/বিভাগীয় ওয়েবসাইটসহ নিয়োগ বিজ্ঞপ্তির সর্বাধিক প্রচার নিশ্চিত করতে হবে। আবেদনের জন্য পর্যাপ্ত সময় দিতে হবে এবং তা কার্যকর করতে হবে।
নথি প্রাপ্তি স্বীকারের ব্যবস্থা	যেসব বিশ্ববিদ্যালয়ে আবেদনপত্রের সাথে নথি জমা দেওয়ার পরে তার প্রাপ্তি স্বীকারের ব্যবস্থা নেই সেসব বিশ্ববিদ্যালয়ে নথিপত্র প্রাপ্তি স্বীকারের ব্যবস্থা থাকতে হবে। অনলাইনে আবেদন করার ব্যবস্থা থাকতে হবে।
প্রার্থীতা মূল্যায়নের পদ্ধতি ও ধাপসমূহ	স্বচ্ছ প্রক্রিয়ায় প্রার্থীতা মূল্যায়ন নিশ্চিত করতে হবে এবং প্রার্থীদের আবেদন সাপেক্ষে তা জানার ব্যবস্থা থাকতে হবে।
নিয়োগ পরীক্ষা কাঠামো ও নম্বর প্রদান প্রক্রিয়া	নিয়োগ পরীক্ষায় অ্যাকাডেমিক ফলাফল, ডেমোন্সট্রেশন ক্লাস/উপস্থাপনা ও মৌখিক পরীক্ষায় আলাদা নম্বর রাখাসহ সকল অংশে প্রাপ্ত নম্বরের ভিত্তিতে নিয়োগ চূড়ান্ত করতে হবে।নম্বর প্রদান প্রক্রিয়ার সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি (ফরমেট) থাকতে হবে এবং নম্বর দেওয়ার পরে তার নথি সংরক্ষণের ব্যবস্থা থাকতে হবে।
নোট অব ডিসেন্ট	‘নোট অব ডিসেন্ট’কে গুরুত্বসহকারে বিবেচনায় আনতে হবে। সিন্ডিকেটে ‘নোট অব ডিসেন্ট’ এর বিষয় নিয়ে আলোচনা করার বাধ্যবাধকতা নীতিমালায় অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।
অভিযোগ দায়ের ও নিষ্পত্তি	নিয়োগ সংক্রান্ত অভিযোগ দায়ের ও কার্যকর নিষ্পত্তির ব্যবস্থা থাকতে হবে।
তথ্যের উন্মুক্ততা	প্রার্থীদের আবেদন সাপেক্ষে নিয়োগ সংক্রান্ত সকল তথ্য জানার ব্যবস্থা থাকতে হবে বিশেষ করে প্রার্থীদের অ্যাকাডেমিক যোগ্যতা ও নিয়োগ পরীক্ষায় সকল ধাপের ফলাফল প্রকাশের ব্যবস্থা থাকতে হবে।
বিধি লঙ্ঘনে জবাবদিহিতা	নিয়োগ সংক্রান্ত নিয়ম লঙ্ঘনে কার্যকর জবাবদিহিতা ও শাস্তির ব্যবস্থা থাকতে হবে।

২. **উপাচার্য ও উপ-উপাচার্য নিয়োগ বিধিমালা প্রণয়ন:** উপাচার্য ও উপ-উপাচার্য নিয়োগে সুনির্দিষ্ট নীতিমালা ও বিধিমালা প্রণয়ন করতে হবে। এতে উপাচার্য ও উপ-উপাচার্য নিয়োগে ন্যূনতম যোগ্যতার মানদণ্ড ও নিয়োগ প্রক্রিয়া উল্লেখ থাকবে। এক্ষেত্রে জ্যেষ্ঠতা, ভালো অ্যাকাডেমিক ফলাফল ও প্রশাসনিক অভিজ্ঞতা, যেমন - বিভাগীয় প্রধান ও ডিন হিসেবে দায়িত্ব পালনের অভিজ্ঞতা, কর্মজীবনের রেকর্ড ইত্যাদি যাচাইসহ বিশ্ববিদ্যালয়ভিত্তিক অ্যাকাডেমিক কাউন্সিলের মতামত নেওয়া ইত্যাদি উল্লেখ করতে হবে।

৩. **নিয়োগ প্রক্রিয়া শিক্ষক সমিতির প্রভাবমুক্ত করা:** নিয়োগ প্রক্রিয়াকে শিক্ষক সমিতির প্রভাবমুক্ত করতে হবে এবং শিক্ষক সমিতির কার্যক্রম তাদের পেশাগত স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট বিষয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে হবে।

৪. **ফলাফল ইঞ্জিনিয়ারিং বন্ধকরণ:** অ্যাকাডেমিক পরীক্ষার প্রতিটি পর্যায়ে, যেমন - প্রশ্নপত্র তৈরি ও খাতা মূল্যায়নে পর্যায়ক্রমে পরিবর্তনের মাধ্যমে একাধিক শিক্ষক নিয়োজিত থাকার ব্যবস্থা থাকতে হবে।

তথ্যপঞ্জী[৪৩]

১. Akhter, Muhammad Yeahia. "Transparency in Tertiary Education: Politics, Admission and Recruitment."In *University of Dhaka,* edited by Imtiaz Ahmed and Iftekhar Iqbal. Dhaka: Prothoma Prokashan, 2016.

২. Aminuzzaman, Salahuddin M. "Quality issues of higher education in Bangladesh." *Journal of General Education*. 1 (2011): 1-15.

৩. Ashraf, ASM Ali. "Political Cleavages, Patronage and Campus Insecurity."In *University of Dhaka*, edited by Imtiaz Ahmed and Iftekhar Iqbal, 201-231. Dhaka: Prothoma Prokashan, 2016.

৪. আখতার, মুহাম্মদ ইয়াহ্ইয়া। *সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে দুর্নীতি: স্বরূপ ও প্রতিকার।* ঢাকা: ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ ও এএইচ ডেভেলপমেন্ট পাবলিশিং হাউজ, ২০০৮।

৫. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, *জাতীয় শিক্ষানীতি* ২০১০, শিক্ষা মন্ত্রণালয়।

৬. বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন, *৪১তম বার্ষিক প্রতিবেদন*, ২০১৪।

৭. *সর্বজনীন মানবাধিকারের ঘোষণাপত্র*।

৮. *গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান ২০০০*।

৯. বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ, *নির্বাচনী ইশতেহার ২০১৪*।

১০. Panday, Pranab Kumar and Ishtiaq Jamil. "Impact of Politicization on the Recruitment of University Teachers in Bangladesh: The Case of the University of Rajshahi." Available at http://www.napsipag.org/pdf/pranab.pdf. Accessed on August 30, 2016.

১১. Zafar, Abu, Mukul Ahmed, Abdullah I. Khan, Shahnaz Sharmin and Mohammad T. Islam, "A Vivacious Delineation of Public Universities at Dhaka: An Emphatic Gaze on Quality Education,"*Australian Journal of Business and Management Research*, Vol. 3 (August 2013)5: 26.

১২. BSMRMU, Act No. 47 of 2013.

১৩. হাসান, শরিফুল। "অনিয়ম ও দুর্নীতির প্রমাণ মিললেও উপাচার্য বহাল।" *প্রথম আলো*, আগস্ট ২, ২০১৫।

১৪. *প্রথম আলো*, ডিসেম্বর ২০, ২০১৪।

১৫. শরিফুজ্জামান। "অনিয়মের জালে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।" *প্রথম আলো*, জুলাই ৬, ২০১৪।

১৬. শরিফুজ্জামান এবং মোশতাক আহমেদ। "সরকারি আট বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়োগে অনিয়ম।" *প্রথম আলো*, মে ৩০, ২০১৩।

১৭. বড়ুয়া, নিবারণ। "শিক্ষকদের আসল যোগ্যতা দলীয় রাজনীতি।" *বাংলাদেশ প্রতিদিন*, জুন ২২, ২০১৩।

১৮. *বাংলাদেশ প্রতিদিন*, এপ্রিল ২৪, ২০১৪।

১৯. *মানব জমিন*, আগস্ট ২৫, ২০১৩।

১০. *যুগান্তর*, নভেম্বর ৬, ২০১৩।

২০. *কালের কণ্ঠ*, ফেব্রুয়ারি ২০১৬।

২১. *The NewAge*, August 10, 2014.

২২. *The Daily Star*, August 7, 2008.

২৩. Tusher, Hasan Jahid. "Teachers' link to politics blamed for political appointment at DU." *The Daily Star*, September 18, 2005.

২৪. http://www.ugc.gov.bd/en/home/university/public/120. Accessed on September 6, 2016.

---

[৪৩] শিকাগো রেফারেন্স সিস্টেম অনুযায়ী প্রণীত (http://www.chicagomanualofstyle.org/tools_citationguide.html,accessed on November 7, 2016).